"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

কবিতা এবং শিল্পচর্চায় নিবেদিত

উত্তরসূরি

২৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে গত ত্রিশ বছরের প্রতিষ্ঠিত কবিদের সঙ্গে রয়েছেন তরুণতম কবিগণ। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র-র মূল্যায়ন প্রবন্ধ, পাস্তেরনাক বিষয়ে অসাধারণ ব্যক্তিগত রচনা। কবি বিষ্ণু দে-র লেখার প্রতিলিপি

দধিমঙ্গল

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে দধিমঙ্গল উৎসবের যোগ রয়ে গেছে। দধির সঙ্গে মঙ্গলের কেন এই যোগসূত্র? এই সুন্দর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি পালনের ভেতরকার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে দধির মধ্যে আছে যৌবনকে ধারণ করার ও সর্ব রোগমুক্ত দীর্ঘ আয়ু অর্জনের অনন্ত উপাদান।

ভারতীয়দের মধ্যে বহুকাল ধরে এই যে-ধারণা সংস্কারের মতো কাজ করছে, আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দধির বিবিধ গুণাবলীর আবিষ্কার তাকেই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে।

দধি শরীরের ক্লান্তি দূর করে, প্রাণশক্তি বাড়িয়ে দেয়। তাই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রত্যহ প্রথম পানীয় হিসাবে দধির ব্যবহার এক অতি পুরনো প্রথা। দধির সব চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম ফসফটকে শোধন করে দেয় ও শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস উৎপন্ন করে। এটা শরীর গঠনের এবং পুষ্টির কাজে বিশেষ সহায়ক॥

●

Calcutta University Publication

1. A History of Sanskrit Literature, Vol I
   —by Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. N. De Price Rs. 60 00
2. Hundred years of the University of Calcutta
   —Price Rs. 25 00
3. Indian Cultural Influence in Cambodia
   —by B. B. Chatterji. Price Rs. 12·00
4. Indian Religion (Girischandra Ghosh Lecture)
   —by Sri Rameschandra Majumdar. price Rs. 3 00
5. (An) Introduction to Indian Philosophy
   —Dr. S. C. Chatterjee & Dr. D. M. Datta. Rs. 10 00
6. (An) Introduction to Tantric Buddhism
   —br Dr. Sasibhushan Dasgupta. Price Rs. 10·00
7. জনমানসের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা—শ্রীহরিচরণ ঘোষ Rs. 7·00
8. জ্ঞান ও কর্ম্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Rs. 6·00
9. Kamala Lecture—Janardan Chakrabarty (Sri Radha Tatwa O Chaitanya Samskriti in Bengali Price. Rs. 12·00
10. Do. ,, —Dr. Nilratan Dhar (World Food Crisis)
    Price Rs. 15·00
11. Do. ,, —Madhya Yuger Banglar Samskriti (in Bengali)—by Dr. Rameschandra Majumdar
    Price Rs. 5 00
12. কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম ভাগ)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
    বিশ্বপতি চৌধুরী Rs. 20 00
13. কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য Rs. 10·00
14. কিশোর গীতা—এইচ. ঘোষ Rs. 3 00
15. KRSNA in History and Legend
    —by Dr. Bimanbehari Majumdar Price. Rs. 20·00

N.B. Books will be available in the Sales.Counter at Asutosh Building, Calcutta University.

Publication Department,
Calcutta University,
48, Hazra Road,
Calcutta-19

বঙ্গদেশে, অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা চিহ্নিত পশ্চিমবঙ্গে, প্রায় সহস্রাধিক ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাকে 'উত্তরসূরি' পত্রিকা স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টাতেই ব্যবসায়িক মুনাফালোভী পত্রিকার ভিৎ নড়ে উঠছে। সঙ্গীত বিষয়ক ক্ষুদ্র পত্রিকা "রঞ্জনী" পড়ে বাঙ্গালীর গানের বর্তমান রুচিবিকৃতি বন্ধ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

বৈষ্ণব পদ সংকলন	দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১·০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড)	উপদেশনা : সুকুমার সেন	২৫·০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড)	উপদেশনা : সুকুমার সেন	৩৫·০০
শিল্পের স্বরূপ (Leo Tolstoy-What is Art ?)	অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	৮·০০
বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি	হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০·০০
চার্বাক দর্শন	দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী	১৫·০০
ন্যায় দর্শন (১ম খণ্ড)	ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	২০·০০
ফরাসী বিপ্লব (২য় সংস্করণ)	প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী	২৫·০০
সিরাজ-উদ্-দৌলা	মৃণাল চক্রবর্তী	১৪·০০
সমাজতত্ত্ব (৩য় সংস্করণ)	পরিমল ভূষণ কর	১৫·০০
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (৩য় সংস্করণ)	গৌরীপদ ভট্টাচার্য	১৮·০০
আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদের ভূমিকা (C. E. M. Joad)	অনুবাদ : দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭·০০
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	বিশ্বনাথ ঘোষ	১৫·০০
ফ্রয়েড	সুনীলকুমার সরকার	৯·০০
পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা (২য় সংস্করণ)	রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী	১৮·০০
ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়	নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অশোককুমার মুখোপাধ্যায়	২২·০০
যুক্তরাজ্যের শাসন ব্যবস্থা	অক্ষয়কুমার ঘোষাল	১২·০০
বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার	নরেশচন্দ্র জানা	১৩·০০

আরো অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগ করুন

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৬-৭৮৫৪।

…মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা…
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে…
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে…

—শ্রীমা—

উত্তরস্মৃতি ১১৬

পুরোনো কলকাতার সঙ্গে যে-নামটি অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে তা হচ্ছে ভীমচন্দ্র নাগ। একসময়ে বহুবাজার বা বউবাজার অঞ্চলকে বনেদী মনে করা হ'ত। ভীমচন্দ্র নাগ সেই প্রাচীন উত্তরাধিকারকে এখনো ধরে রেখেছে।

মিষ্টান্ন শিল্পে অগ্রণী ভীমচন্দ্র নাগ তার ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

●
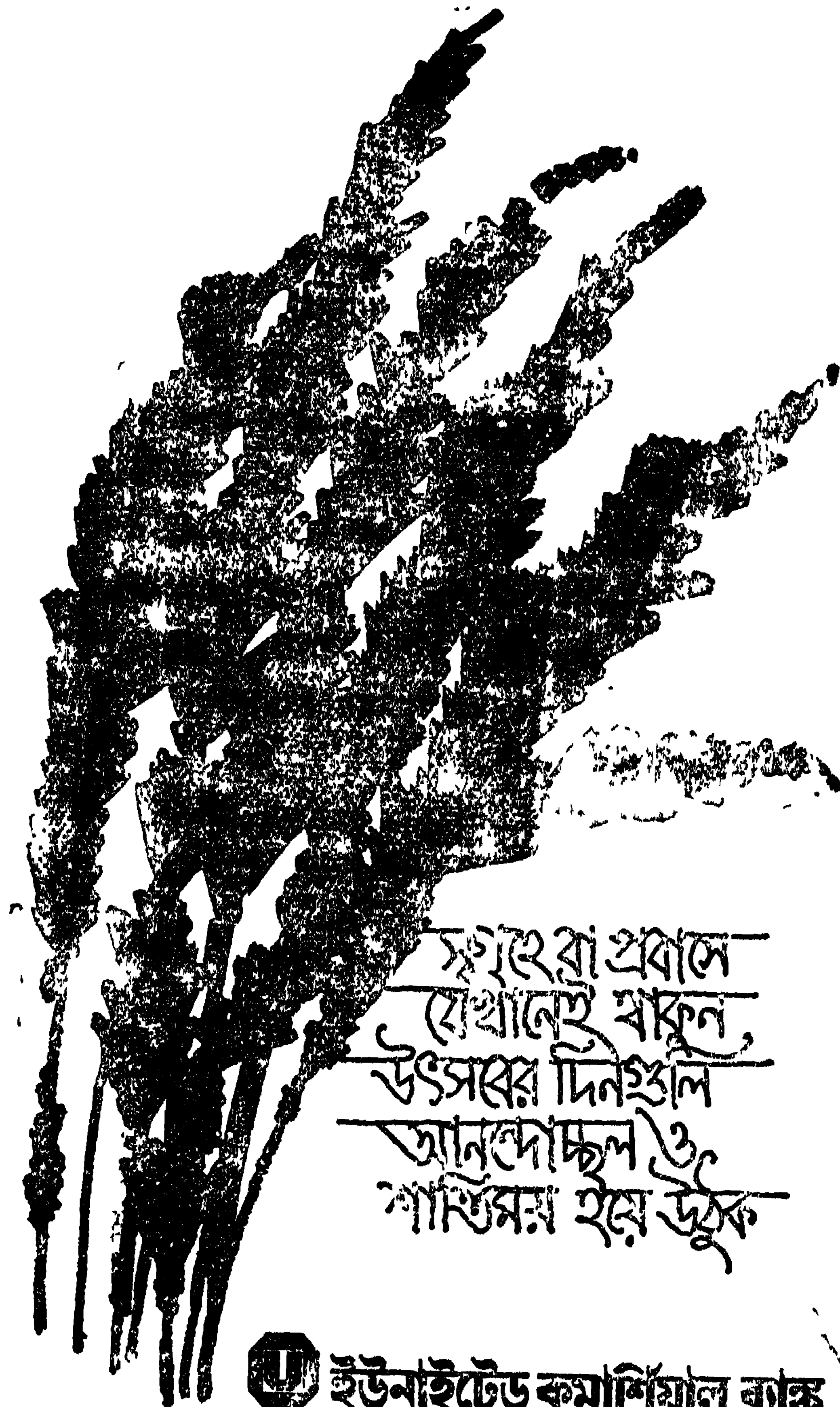
স্বজনেরা প্রবাসে
যেখানেই থাকুন,
উৎসবের দিনগুলি
আনন্দোচ্ছল ও
শান্তিময় হয়ে উঠুক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
UCO/CAS-117/82 BEN

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরসূরি ১১৬

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।"

প্রেমকে তৃতীয়কে

প্রেমের স্বতন্ত্র সত্তা, কে জানত, যে এমন যন্ত্রণা!
এ যন্ত্রণা কতকাল হবে বলো, প্রেয়সী, সইতে?
মাথা পেতে নেব তুমি যা দেবে গঞ্জনা,
যদি না ইচ্ছাই হয় নাই এলে আমার অদ্বৈতে,
তৃতীয়কে করো তুমি পরিহার, ও উপরি ব্যঞ্জনা

অসহনীয় যে সখী আমাদের কাব্যের যমকে।
উভয়েরই বন্ধু প্রেম আমাদের মাঝে কথা কইতে
থাকে কেন ত্রিনয়নে খেয়ালের নানান দমকে?
মিলাও প্রেমকে প্রিয়া তোমার আমার এক দ্বৈতে,
কঙ্কণঝঙ্কারে তাকে বশে আনো ঘনিষ্ঠ ধমকে॥

~~১৩/৩/৬২~~

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র হস্তলিপি

জর্জ সেফেরিস : ইতিকথা ১০

[রূপান্তর : বিষ্ণু দে]

আমাদের দেশ একটা নিরুদ্ধ ভূমি, সব পাহাড়
আর পাহাড়গুলি নিচু আকাশে চাপা, দিনরাত।
আমাদের নদনদী নেই, ইঁদারা নেই, ঝরনা নেই,
শুধু কটি চৌবাচ্চা, তাও শূন্য ; সেগুলো ঠং ক'রে বাজে
আর আমাদের পুজা পায়।
আওয়াজটাই হাজা-মজা, ফাঁকা, আমাদের নৈঃসঙ্গ্যের মতো,
আমাদের প্রেমের মতো, আমাদের শরীরের মতো।
অদ্ভুত মনে হয় যে একদা আমরাই গড়তে পেরেছিলুম
আমাদের এই সব বাড়ীঘর, এই কুঁড়ে, এই সব গোয়াল বাথান।
আর আমাদের সব বিবাহউৎসব—শিশিরাক্ত মালা,
পাণিগ্রহণের আঙুল,
আজ হয়েছে অসমাধ্য ধাঁধা আমাদের চেতনায়—
কি ক'রে যে জন্মেছিল
আমাদের ছেলেমেয়েরা? বড়সড়ই বা হল কি ক'রে?

আমাদের দেশ একটা নিরুদ্ধ ভূমি। একে ঘিরে রাখে
দুটি বিরোধী নিকষ পাথর। এবং যখন রবিবারে
আমরা হাওয়া খেতে যাই বন্দরের ধারে,
দেখি, সূর্যাস্তে আলোকিত,
অসম্পূর্ণ অভিযানের ভাঙা ভাঙা তক্তা,
যত সব শরীর যারা আর ভালোবাসতেও জানে না॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়

১.

শিব গড়তে বাঁদর···

তবুও যদি বাঁদর ?
কিন্তু এটা চামচিকে ;
কিনলে পাবি পাঁচশিকে ।

২.

টিকটিকিটার লেজে বাঁধা
মহাদেবের টিকি ;
অষ্টপ্রহর গান শুনি তার :
'যা ক'রেছি, ঠিকই ।'

৩.

গাধাকে সবাই চেনে, গাধা
কিন্তু কে তার দাদা
এ বড় কঠিন ধাঁধা—
উত্তর জানে শুধু গাধা ॥

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

অরুণ ভট্টাচার্য

চারিদিকে খেলাঘর
(গুম্ফাবাবুর জন্য কয়েকটি)

১. গুম্ফা তুই রোদ ধরতে গিয়েছিলি। জানিস্ না এই রোদ
এই রোদের শিরশির স্নিগ্ধতা তোর শরীরের কোষে
রক্তে তোর এই রৌদ্রের প্রবহমানতা, যেমন
গাছের হাওয়া, নদীর স্রোত, মাতার সস্নেহ। গুম্ফা,
তোর রৌদ্র ধরার অর্থ তোর
নিজেরই ছায়া তোর নিজেরই শয্যা তোর
নিবিড় অস্তিত্বের
আলোকিত জানালায় বসে থাকা।

মিথ্যে রৌদ্র ছুঁতে যাস্, গুম্ফা, বরং
অলস মধ্যাহ্নরৌদ্রে
আকাশের দিকে তুই লক্ষযোজন
স্মৃতিগুলি নিয়ে
মিছিমিছি খেলা খেলবি আয়।

৪. ১১. ৮১

২. ট্রেনের জানালায় তোর আঙুলের দাগ ছিল।

আঙুল কি কথা বলতে পারে,
শব্দহীন ভাষাহীন কথা!

ছোট ছোট আঙুলের ফাঁকে
মমতা জড়ানো থাকে।

মমতায় জড়ানো সংসার।

১৮. ৮. ৮২

৩. হাত-পা-ভাঙ্গা পুতুলটা
পড়ে থাকছে ধুলোয়, তুই
কখন ফিরে আসবি তোর
আদরে আহ্লাদে !

ফের দুলবে পুতুলটা।

হাত-পা-ভাঙ্গা পুতুলটা
রাত্রিবেলা একা
কেমন যেন কান্নায়
পড়ে থাকছে ধুলোয়, তুই
কখন ফিরে আসবি তোর
নিজের রাজ্যপাটে !

ঘুরবে ফিরবে পুতুলটা তোর
আদরে আহ্লাদে !

৪. বারান্দায় রুমাল নাড়লে
তোর কথাই মনে পড়ে
বারান্দায় মাধবীলতার আড়ালে তোর
দুষ্টু চোখ দুটি তখন
ভারী হয়ে আসে, তুই
সত্যি কি বুঝতে পারিস্
এবার ট্রেণ হুইসল্ বাজিয়ে
সবুজ পতাকা উড়োবে !

এই সব দুদণ্ডের খেলা-খেলা
সময়ের হাত ধরে
কোথায় যে চলে যাবে

আশ্বিনের হালকা মেঘ যেমন
উধাও শূন্যে বল্গাহীন
দিক্‌চিহ্নহীন।

১০. ১১. ৮২

৫. সাজানো সংসার ফেলে চলে গেলি,
ফিরে তাকালি না?
ঘরের চারদিকে তোর পুতুলরা ঘুরছে ফিরছে
(ট্রেণ যাচ্ছে হু হু শব্দে হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে)
রাঙা ফুটবল ঠিক মাঠের সেন্টারে আছে
খেলা শুরু হবে বলে,
দুধের কৌটোগুলো মুখ-খোলা এধার ওধার
ছিন্ন কাঁথা, ছেঁড়া জামা, বাক্স-ভর্তি লজেঞ্চেস।
(ট্রেণ চলছে হু হু শব্দে হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে)

সব এখন শূন্য ঘরে। শূন্য ঘরে
হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে তোর
উজ্জ্বলতা, চোখে
গভীর দুষ্টুমি। তোর
শান্তি অশান্তি তোর হাসিকান্না সব কিছু দিয়ে
জমাট সংসার

কেন তুই নিষ্ঠুরের মত সব
ফেলে চলে গেলি,
একবার ফিরে তাকালি না!
(ট্রেণ ছুটছে হু হু শব্দে হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে)

১৯, ৮, ৮২

৬. শুতে পারছি না, ঘুম
আসলেও বারান্দায় ঠায় বসে থাকছি।

তোর আসবার কথা আছে, ট্রেণের
সময় গেলেও আশা থাকে।

আশা নিয়ে বসে আছি, খুটখাট
শব্দ হলে দরজায় তাকাই।
ট্রেণের সময় গেলে
কী-ই বা আর করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র বসে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়,
তুই যেন হঠাৎ আসলি
আমার মুখচোখ
দুই ছোট উত্তপ্ত হাতের
দশ আঙুলে ছেনেছুঁয়ে বললি আচমকা,
ত্যাখো দাদা, এই আমি !

১৮, ৯, ৮২

(মধুমাধবী ঋতুপর্ণার জন্ত কয়েকটি)

১. তোদের চিঠিতে কী জাদু থাকে
সঙ্গে এক ভয়ানক
গোপন উষ্ণতা।

আকাশ বাতাস ভরে যায়।
কাঁদতে থাকে সুদূরের চিল
আষাঢ়-এ রথের রশি
মনে পড়লে একশ' হৃদয়

শৈশবের স্মৃতিবেদনার
সুখদুঃখ টেনে আনে।

তোদের চিঠিতে সেই
বিরহরজনীদীর্ঘ শৈশবকে ফিরে পাই,
ফিরে পাই
গাছলতাগুল্মের আড়াল

যা দিয়ে সাজিয়েছি এই
অসহায় ভগ্ন দেহ।

১৫. ৭. ৮২

২. আজকাল আর কেউ দাঁড়ায় না ঝুলবারান্দায় ;
বলে না, আবার এসো বৃষ্টি নামলে।
বলে না, সাবধানে থেকো এই শীতে,
ভালো থেকো।

রাত্রি হলে এইসব স্মৃতিবেদনার কথা
জমা হয়।
তোদের উদ্বিগ্ন চোখ, ঠাণ্ডা মুখে
শীতের আল্পনা
ঘুমচোখে দাগ কেটে যায়।

বর্ষাতেও চোখ জ্বালা করে ;
এই শীতে কাকে যেন খুঁজি।
ঘরের চারদিকে তাকাই। কিছু না, কিছু না শুধু

কার্নিশে মাকড়সা তার জাল বুনে চলছে একা একা

১৯.৮. ৮২.

৩. ছেড়ে যাবার সময় সব কিছুই ঝাপ্‌সা লাগে।

চশমা ঠিক আছে, আজ সকালে
এমন কিছু কুয়াশাও ছিল না।

তবু তোদের থেকে আচম্‌কা মুখ ফেরাতেই
মনে হলো, সামনে কিছুটা শিশু অন্ধকার ;
যেন গাড়ি আর চলবে না। অন্ধকার তার
রাস্তা জুড়ে হামাগুড়ি দেবে।

তবুও পৌঁছুতে হবে। কালই।
বাড়ি ফিরে অনেকদিনের জমা চিঠি
জমে-থাকা ধুলো
জানালা খোলার শব্দে
বাসি ঘরের জমাট গন্ধ
এমনি আরো টুকিটাকি কিছু
স্মৃতি ভরে নিতে হবে।

৭. ১. ৮২.

৪. চিঠি খুলতে খুলতে চোখ জ্বালা করে আসে।
শেষ অবধি পড়া হয় না
কয়েকটা অক্ষর
কিছু অক্ষর-সাজানো শব্দ।

দূরে কাছে সব একাকার করে দেয়, মুহূর্তেই
স্থানকালপাত্র ভুল হয়
ভুল হয়ে যায় দিগ্বিদিক।

সামান্য কয়েকটা শব্দ, অক্ষরে সাজানো শব্দ।
কী জাদু এই অন্তরঙ্গ খামের ভিতর !

২৩. ১. ৮২

(ঋতুপর্ণার জন্য)

তুই যখন চলে যাস্ আচম্‌কা রিক্সায় উঠে ফের
মাঝেমধ্যে আসিস বা টেলিফোনে দুচারটে কথা
ছিট্‌কে চলে আসে, 'বাবা, তুমি
আছো তো ঠিক, সময়মত স্নান বা ঘুম,
বাড়ছে না তো প্রেশার তোমার,' তখন
বুক জুড়ে হাহাকার কান্না ঘন হয়ে আসে, কন্যা,
দীর্ঘ রাজপথের বাসস্টপে কতটুকু সময় বা আর
এস-বাস দাঁড়াবে রে, বুঝি তোকে দেখবার আশায় !

চোখ ভরে জল আসলেও কখনোই জল ফেলতে নেই।

প্রতি শনিবার ভাবি এবার কিছুটা সাহস বুকে
বেঁধে নেবো, কিছুটা শক্ত করবো পিতার হৃদয়।

এমনি আবহমান সংসারের স্থির চিত্র। তাই
উমার সংসারে আশ্বিনে কাশফুল ফোটে, দশমীতে
সোহিনীর স্বর। বুক ভরে হাহা শূন্য
মাঝে চারদিনের হুল্লোড়ে
ঋতু, তোর সাজপোষাকে অফুরন্ত পিতার আহ্লাদ।

কার্তিকের টুপটাপ শিশিরের শব্দে ঘুম পায়।
ঘুম পায় যদিবা কখনো তোর সুখস্বপ্ন দেখতে পাই
মধ্যযামে, নক্ষত্রেরা দল বেঁধে যেসময়
পশ্চিম আকাশে নেমে পড়ে।

১৬. ১. ৮২

(স্মিতার জন্য)

স্মি, তোর আলতো চুলে
শেষ সূর্যের আলো পড়লে কেমন দেখায়

তা তুই বুঝিস্ নে।

গাছগাছালির মধ্যে লতাপাতার শিকড়ে তোর
আঙুলগুলি কেমন খেলা করে
তাও দেখিস্ নে।

চারিদিকের আকাশবাতাস ঘন নীলের মধ্যে
স্নিগ্ধ তোর ছোট্ট শৈশব যে
নিজেই একটা অপরূপ ছবি
তা-ও জানিস্ নে।

সব মিলিয়ে আমরা তোর এই দৃশ্যপট দেখি
শৈশব যখন অমলিন শুদ্ধতায়
সন্ধ্যাতারা হয়ে ফুটে উঠতে চায়।

৪, ১০, ৮২

সিদ্ধেশ্বর সেন

আমাকে নিও, পরোক্ষেও

আমাকে কী নেবে প্রত্যক্ষের উষায়,
নিও পরোক্ষেও,—
যেমন তা মেশা ত্রিযামায়

সন্ধ্যা যেমন উষসীকে, কার আশায়,
পরবাসী সে কী—
ফিরেও আসবে ঘরে

কে তোমায় দেবে আমার এ সংশয়
যা দিয়ে বেঁধেছি তোমায়
প্রাণে ও মনে

বেঁধেছি আবার সেধেছি
তোমারই দান,
তেমন সাধন চলেছে রাত্রিদিনে

আমি তাই-ই আছি
নেইক' আমার ক্লান্তি,
পড়েও না বুঝি পলক

আমি ভাবি কে সে,
আনে তৃষ্ণার শান্তি
নন্দন-ছোঁয়া ঝলক

পরবাসী সে কী—
ফিরেও আসবে,
ঘরে ॥

আলোক সরকার

আবহমান

"Fair Daffodils, we weep to see
You haste away so soon" —Robert Herrick

সুন্দরী মল্লিকাফুল আমাদের কতো কষ্ট হয়
যখন ম্লান হয়ে আসে তোমার পাপড়িগুলো।

কত মসৃণ সাদা রঙ আর ঋজু দাঁড়ানোর ভঙ্গী
সবকিছুই নত হয়ে আসে আস্তে-আস্তে।

কষ্ট আসলে নিজেদের কথা ভেবেই সে তো তুমি বুঝতেই পারো
কত শব্দহীন ম্লান হয়ে যাচ্ছি আমরাও।

কিছুই করার নেই আমাদের কিছুই করার নেই তোমার
ওই কেবল ঝলমল ক'রে ফুটে ওঠা—

সারা পৃথিবীটাই ঝলমল করে ফুটে উঠছে, একমুহূর্ত বিরাম নেই কোথাও
চোখ ঝলসে দিচ্ছে মসৃণ আর দিগ্‌বিজয় রঙ।

কেউ দেখতেই পাচ্ছে না মলিন অন্ধকার, আলো যখন জ্বলে
তখন তো কোনো অন্ধকারকেই দেখা যায় না।

এতো অনুত্তাপিত সেই অন্ধকার ক্ষয়, এতো সঙ্গহীন—
সঙ্গহীন নিঃশেষের তাপ তোমার তো তা জানাই।

আসলে কষ্ট পাওয়াটাই আমাদের নিয়তি, সুন্দরী মল্লিকাফুল
এসো আমরা একসঙ্গে কষ্ট করি।

এ ছাড়া কী-ই বা করার আছে আমাদের, এই এখন যেমন
তোমার দিকে চেয়েও দেখছি না একবার

তুমিও দেখছো না আমাদের আর আমাদের মাঝের শূন্যতায়
কতো ঘন কত নিবিড় হচ্ছে বুক চিনচিন-করা একটা কষ্ট।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মাঝখানে দাঁড়িয়ে

তুমি মানুষ
চৌদিকে তোমার বেজে উঠেছে নিগ্রো নাকাড়া ষড় গোস্বামীর মৃদঙ্গ
তুমি গোটা ব্যাপারটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো
তুমি যা করবে সেটাই হয়ে উঠবে সমগ্র মনুষ্যত্বের মানদণ্ড

তুমি মানুষ
তোমার পরিণীতাকে সত্যেন্দ্রনাথের মতো প্রকাশ্যে ঘোড়ার পিঠে
বসিয়ে দাও যারা তোমাকে স্ত্রৈণ বলবে
তারাই তোমার অনুকরণে মেতে উঠবে

মানুষ তুমি
স্নায়ুর অসুখ সারাবে বলে এসেছো পৃথিবীতে
আজ তোমার বুড়ো মাস্টার মশাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন নিজে

তাঁকে নিয়ে তোমার ধরিত্রী ঘুরিয়ে আসার সময়
দেখতে পেয়েছো ধর্ষকাম এক যুবা
তাকে অবজ্ঞা না করে তোমরা গল্প করতে-করতে এগিয়ে যাও ॥

জগন্নাথ বিশ্বাস

বৃষ্টি এলে

সব কিছুই বৃষ্টি এলে ছেড়ে দেবো
এখন কেবল
মেঘকে ধরার ফাঁদ পাতা।

বৃষ্টি এলে সব কিছুই ছেড়ে দেবো

কেননা তখন
কেবলই ভেজবার নেশা আসে,
বাতাসে বাঁচবার গন্ধ
তখন গভীর হয়ে ভাসে।

এখন বনস্থলী তাই
রণস্থলে পরিণত,
যুদ্ধ প্রস্তুতিতে
কাজ চলে বিশ্রাম বর্জিত।
বৃষ্টি এলে সব কিছু অবসান
তাই, সব কিছুই ছেড়ে দেবো।

ফজল শাহাবুদ্দীন

বহুবর্ণমন্থিত আনন্দে

জানলাম একটি আনন্দের নির্যাস থেকে
আমার জন্ম
একটি আনন্দের সর্বকালব্যাপী শিখার উপর
আমার জীবন গতিমান
এবং আমার মৃত্যু
সেই আনন্দের মধ্যে প্রত্যাবর্তন এবং বিলয়

সেই আনন্দ যার এক একটি কণা থেকে প্রতিদিন
জন্ম নিচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
জন্ম নিচ্ছে বিশ্বাস অবিশ্বাস আদি অন্ত চিন্তা চৈতন্য
আত্মা পরমাত্মা প্রেম প্রজ্ঞা ভূমি এবং শরীর
আমার জন্ম সেই আনন্দ থেকে উত্থান

আমার মৃত্যু সেই আনন্দের মধ্যে প্রত্যাবর্তন
শরীর এবং আত্মার অচিন্ত্যনীয় সন্ধিক্ষণের চূড়ায়
যেখানে তুমি অধিষ্ঠিত
অবিশ্বাস্য আলোতে অন্ধকারে দেখায় অদেখায়—
আমি সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু বিশাল আনন্দের
বহুবর্ণমণ্ডিত অন্তরাত্মায়
জন্ম জীবন এবং মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত
আন্দোলিত—
তোমার মুগ্ধতায় তোমার প্রার্থনায় তোমার যৌনতায়
নিমজ্জিত নির্বাপিত উত্থিত এবং প্রসারিত
জানলাম যখন আনন্দ ছিলো না কিছুই ছিলো না
তুমি ছিলে না শরীর ছিলো না
জন্ম মৃত্যু জীবন ছিলো না।

যখন তুমি ছিলে না তখন কিছুই ছিলো না
যা ছিলো তাও ছিলো না, যা ছিলো না তাও ছিলো না
আকাশ ছিলো না অন্তরীক্ষ ছিলো না
নক্ষত্ররাজি ছিলো না শূন্যতা ছিলো না
এবং শূন্যতার উপরে স্বর্গ ছিলো না নরক ছিলো না
স্বর্গ নরক আকাশ অন্তরীক্ষের চিন্তা ছিলো না
চিন্তার উৎস যে শক্তি সেই শক্তি ছিলো না
এবং শক্তির যে অনন্ত উৎস ঈশ্বর
সেই ঈশ্বর ছিলেন না—
মৃত্যু ছিলোনা অমরত্ব ছিলো না
দিন ছিলোনা রাত্রি ছিলো না
উষালগ্ন ছিলো না সন্ধ্যারাত ছিলো না
সূর্যোদয় চন্দ্রিমা গ্রহচ্যুতি কিংবা নক্ষত্রপতন
কিছুই ছিলো না

তখন অন্ধকার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো
শূন্যতা শূন্যতার ভিতরে আর্তনাদ করছিলো
ক্ষুধা ক্ষুধার ভিতরে কেবলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলো
শরীরবিহীন এক শরীর
তখন একটি তীক্ষ্ণ-স্পর্শের প্রতীক্ষায়
একটি মন্থিত অবয়বের জন্য ক্রমাগত
চীৎকার করছিলো
এবং সেখানে
সূর্যোদয় চন্দ্রিমা চুম্বন নরক এবং নক্ষত্রপতন
কিছুই ছিলো না
সেই বিশ্বাসহীন অবিশ্বাসহীন রক্তহীন মাংসহীন
হিংসা প্রতিহিংসাহীন শক্তিহীন ঈশ্বরহীন অবস্থার মধ্যে
হঠাৎ অকস্মাৎ
মহাকাশময় সর্বগ্রাসী একটি বিন্দুর অন্তরাত্মা থেকে
একটি অনন্দঘন জ্যোতিকণা প্রস্ফুটিত হল

আমার জন্ম আমার জীবন আমার মৃত্যু
একটি আনন্দের শরীর হ'য়ে তোমার মধ্যে প্রকাশিত হল প্রতিষ্ঠিত হল
তোমার তীব্র চুম্বনে আনন্দ মর্মরিত হল
তোমার তীক্ষ্ণ আলিঙ্গনে আনন্দ উচ্চারিত হল
তোমার রতিমন্থনে অনন্দ লণ্ডভণ্ড হল
তোমার শরীর হ'য়ে আনন্দ একটি নক্ষত্রের মতো জ্ব'লতে থাকলো

জানলাম একটি আনন্দের নির্বাস থেকে
আমার জন্ম
একটি আনন্দের টংকারে আমার জীবন গ্রথিত
এবং একটি আনন্দের প্রসারিত রাত্রিতে আমার মৃত্যু
তোমার শরীর আমার জন্ম তোমার শরীর আমার জীবন
তোমার শরীর আমার মৃত্যুর মর্মরিত নিস্তব্ধতা

কল্যাণ সেনগুপ্ত

দুটি কবিতা

১. দহন : এত তীব্র আলো কেন সারারাত জ্বেলেছ উঠোনে !
চীৎকার করেছে কষ্টে চারাগাছগুলি
কিছু কি শোনোনি ?
ভোরে উঠে যদি
সমস্ত উঠোনময় ছাখো পোঁতা আছে
কালো কালো শিশুর আঙুল ?

২. বিচ্ছিন্ন : এক একটা বিচ্ছিন্ন দৃশ্য বহুদূর থেকে
সরাসরি ছায়া ফেলে বুকের ভিতরে।
কবে কোন নদীতীরে নিঃসঙ্গ একজন
বসে ছিল সূর্যাস্ত অবধি।
শেষে যে কী ভেবে উঠে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল
বিশাল প্রান্তরে !

আনন্দ বাগচী

আলো, আমার আলো

বিপদ সীমার দিকে ছুটে যাচ্ছে জলের শিকড়,
মৃত্যুর পিপাসা নিয়ে, অন্ধকার নিয়ে,
কচুরিপানার সঙ্গে মিশে যায় বাস্তস্মৃতি,
এজন্মের সব ঘনিষ্ঠতা,
অন্ধ ঘোলা স্রোত খায় চতুর্দিক প্রখর ভাঁটায়,

আকাশ কুয়াশা-কানা, শুধু হাতড়ে হাতড়ে দিন যায়,
ঘরের ভেতরে গল্প অভ্যাসে অভ্যাসে জীর্ণ হল,
পরস্পর মুখোমুখি
শেষ অঙ্ক মেলেনি এখনো,
শব্দহীন তাই বসে আছি,
কবে তুমি আসবে এই বুকের ভেতর বাইরে জুড়ে, আলো!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের জন্য নয়

শুভ ফুল, এর কোনোটাই মানুষের জন্য নয়
মানুষের চোখের জন্য নয়
মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্য নয়
সবই তুচ্ছ কিছু পোকা মাকড়ের জন্য
মানুষ তার রূপ দেখেছে
মানুষ তার ঘ্রাণ নিয়েছে
মানুষ লিখেছে কত কাব্য, গেয়েছে গান
গোলাপ, গন্ধরাজ চাঁপারা তা গ্রাহ্যও করে না
তারা শুধু কীট পতঙ্গের জন্য মেলে রাখে সর্বস্ব
হায়, মানুষের জন্য একটাও ফুল ফোটে না!

মানস রায়চৌধুরী

দুটি কবিতা

১, সারারাত এ পাশ ও পাশ।
জ্যৈষ্ঠের আকাশে মেঘ নেই, ভাবি মেঘলোক নেই
এ পাশ ও পাশ আর বালিশে দংশন চিহ্ন, ছিঃ ছিঃ
যেমন আমার ভাবনা, তেমনি আলমারিতে
দোল খায় কামিজ পাতলুন আর ঝন্‌ঝন্‌ ধাতব হ্যাঙ্গার
মনে পড়ে বাউলের দোতারায় দেহতত্ত্ব, অশরীরী গান।

২. চাও বা না চাও তবু কাকে মিথ্যে বলে,
বলে দেবো ঠিক বলে দেবো।
এই যে সকালে তুমি আমার ভিতরে এসেছিলে
সমস্ত দুপুর ধ'রে বারণ-না-মেনে সেই না-মেনে, না-মেনে
তারপর বিকেল হলে আরেক মানুষ ফিরে গেলে
সব সত্যি বলে দেবো, সব মিথ্যে, ভেবো না আমার
খুব বেশি লাজ লজ্জা আছে আমি চক্ষু লজ্জাহীন
ফেলে রেখে গেলে কাঁচা একটি রিবন সেই উদ্‌ভ্রান্ত রঙীন।

শান্তিকুমার ঘোষ

বিশাল প্রান্তর, মহৎ ভূভাগ

বিশাল প্রান্তর, মহৎ ভূভাগ করলে সন্ধান ;
এমন নয় যে ছিল কোনো যাত্রাস্থল।
রৌদ্রতাপে ফলেছে আঙুর, পথের দুধারে রাঙলো শিরীষ ;
চন্দনতরু থেকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছে বাতাস।

আকার নেয় জলস্রোত ; শব্দ শোনো সময়ের ;
আলোকিত সধূম ফোয়ারা সারি—ধূ-ধূ পুড়ে গেল রূপ ॥
ভ্রমরগুঞ্জনের সাথে মেশে প্লেনের গর্জন।
নীলাকাশ অফুরান ঢালছে মদিরা।

শূন্যতা জড়িয়ে ধরে প্রাণপণ রিক্ততাকে।
নিমেষে কপিশ হ'ল স্নবর্ণ গোধূলি।
কে দেবে কল্যাণ-শান্তি-সৌন্দর্যে পূর্ণতা
মৃত্তিকায় কর্ষণ-রেখা, পাথরে শিল্পের স্পর্শ ॥

কবিতা সিংহ

কখন অমল

কখন আলো উদ্ভাসিত হবে ?
কখন দুঃখ দুলবে সগৌরবে
কখন আমার ভিতর জোড়া প্রেম
ছাপিয়ে যাবে শুদ্ধ নিকষহেম
-বর্ণে ধোয়া
অন্তর বৈভবে ?

যে নেই কোথাও, বিশ্বনিয়ম বলে
সেই যে বুকের, শূন্য ভরে জ্বলে
সকল সময় জ্যোতির ধিকি ধিকি
কেবল ফোটায় আলোর কমল
ধবলে অমলে

আমার এখন স্নানের জন্য তৃষা
ঈর্ষাবরণ বস্ত্রখানি ফেলে
অঙ্গ ঢাকি শকুন্ত-বাকলে
স্মরণ তোমার-অঙ্গ ধীরে আভরণে জলে

দুর্বাসা ক্রোধ যার ভুবনে বইছে নিজের রাগে
তখন আমি একলা ভাসি
তোমার স্মরণ-জলে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যুদ্ধ

মানুষের হানাহানি দেখে কুকুর বেড়াল হেসে ওঠে।

মাঝরাতে খুনখুন হয় চাঁদ, মেঘ ভেসে আসে।
আঁধারে তর্পণ করে কারা যেন? শুধু কাছে দূরে
নানারকমের শব্দ শোনা যায়; শুধু ভয়, শুধু অবসাদ—
ট্রেন চ'লে গেলে, লোহার পাতের মধ্যে গুমরে ওঠে
চাপা কান্নার মতো আচ্ছন্ন জীবন।
কিন্তু কিসের জন্যে এইসব? জীবন, জীবন, তার
সমস্ত স্রোতের কিন্তু আরেকরকমভাবে লুটিয়ে পড়ার কথা ছিলো।
এখন কাদায়-পংকে লুটোপুটি করে মানুষেরা,
এখন কাদায়-পংকে সব জল ঘোলা হ'য়ে আসে।
কারা কতদূরে যাবে, কেউ কিছু ব'লতে পারে না—
বাধা আছে, সজ্ঞবদ্ধ শয়তানি দেয়াল তুলেছে চারদিকে,

যদি প'ড়ে যাও, তবে মুক্তি নেই ; যদি বা দাঁড়িয়ে থাকো,
তারও অসুবিধে আছে ।

যদি পারো, তবে এখন আঁধার থেকে
শস্যকণার মতো আলো খুঁটে নাও।

মেঘ ভেসে আসে, মেঘ ; তুমি কি পারবে, ভেবে ছাখো ?

মানুষের হানাহানি যোজন যোজন জুড়ে শব্দ ক'রে ওঠে ॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কলকাতা বিষয়ক

১. কলকাতা, সাবাস কলকাতা !
তুমি কেমন করে আমাদের নিয়ে যাও
তোমার হৃদয়পুরে ! তোমাকে ভালোবাসতে
পারছি না জেনেও তুমি আমাদের
কেমন আরো ভালোবাসা ; তোমার
গা-শিরশির করা অঙ্গ দেখে বুকের ভেতর
যখন মুচড়ে ওঠে তখন শেষ পর্যন্ত
তোমার জন্য আমাদের করুণা ঝ'রে পড়ে !
তুমি নরকের পথ দেখাবে জেনেও,
কলকাতা, তুমি আমাদের মায়ায় বেঁধেছো ;
সুখে দুঃখে কলকাতা তোমার গ্রীষ্মবর্ষা বুকে নিয়ে
শেষ পর্যন্ত পালাতে পারিনি আমরা ;
তোমার সম্মোহিত যাদুদণ্ডে কলকাতা, আমরা

প্রতি মুহূর্তে মরে বেঁচে উঠছি, ছুটছি
শতাব্দীর টানে ক্লান্তিহীন কলকাতা,
তোমার ভালোবাসার আকাশ বাতাস
একদিন আমাদের জীবন শেখায় !

২. কলকাতা তুমি হৃদয় উন্মোচিত করো ;

তোমার বুকের মধ্যে এক রহস্যের নগরী
পাখা মেলে উড়ে যাবে বলে দিন গোনে ।

কলকাতা, তোমার অফুরন্ত ভালোবাসা
বুকের মধ্যে শব্দময় হয়ে কাছে টানছে ;

সময়কে তুমি কেমন হাত তুলে ডাকছো, কলকাতা !

হঠাৎ হঠাৎ

হুটহাট করে কখন কী যে হয়ে যায়
হঠাৎ দমকা ঝড়ে সব তছনছ
উল্টোপাল্টা হাওয়া, ধূলি ঝড়
এবং বৃষ্টি ।
বৃষ্টি ইত্যাদি কখনও কখনও সুখকর
স্মৃতির সুতোয় সোনালী অনুভব আয়োজিত পরিবেশে
রক্তে আবেশ ছড়িয়ে উধাও ;
কিন্তু প্রতিকূল হাওয়ার দাপটে
এই মুহূর্তে সব তছনছ ;
দমকা ঝড়ের সাঁজোয়া গাড়ি
মেঘে মেঘে সাইরেন বাজাচ্ছে

বুকের ভিতর কেমন আন্দোলিত ;
এবং পাশাপাশি ঝড়ে আন্দোলন, বাতাসে আন্দোলন
ঘরে-বাইরে-প্রবাসে আন্দোলন ;

হঠাৎই দমকা হাওয়ার পাগলামিতে
সব তছনছ
হুটহাট করে কখন কী যে হয়, হয়ে যায় ;
উল্টোপাল্টা হাওয়া, ধূলিঝড় এবং আশ্চর্য
হঠাৎ হঠাৎ
কখন কী যে হয়ে যায়।

স্বপ্নের মধ্যে নদী

স্বপ্নের মধ্যে এক নদী
আমাকে নিয়ে যায় উৎসমুখে।
বরফের ঘুম ভাঙলে সে কেমন
ছুটে চলে ; ফেনিল উৎসাহ চোখে মুখে নিয়ে
সে কেমন কাছে ডাকে, হাত ধরে
নিয়ে যেতে চায় জনপদ ছাড়িয়ে
দূরে বহুদূরে সমুদ্রে ;

স্বপ্নের মধ্যে এক এক দিন নদী
আমাকে নিয়ে যায় সমুদ্রে ;
জনপদ ঘুরে ঘুরে কেন জানি না
কিসের অন্বেষণে পৌঁছে যাই বেলাভূমিতে
আমাকে দেখলেই সমুদ্র কেমন যেন উত্তাল হয়ে ওঠে
আমার সেই নারীর মতো।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একলা দুজন

আগে ফুল পিছে ফুল সুমুখে পিছনে
শাড়ি ঝুমঝুম বাজে, একহারা সোঁতার পাড়ে একলা দুজন
চলে যায়···অস্তপাহাড় টলমল করছে। পবন দেবতা
—কে যায়—হাঁকার দিয়ে ঢুকে গেল গাছগাছালির কাম-স্তূপে।

আকাশ ভর্তি গন্ধচন্দনের দাগ। পায়ে পায়ে
শাড়ি ঝুমঝুম···রোগা সোঁতার ভিজেয় একটানা
ডুবছাপ—একলা দুজন, ভার হয়ে আছে উন্নত অবধি।
ঝুঁকি দিয়ে দিয়ে গড়ে দু-পাশ কান্তার দেয়া ছায়া,

অবুঝ পাথর-ভার ফালা দিয়ে মঞ্জরীলতার কালো দীর্ণ নিশ্বাস
—পুড়ে ওঠে···অস্তপাহাড় টলমল করছে—কে যায়—
ঘোড়া গিলে মরে আছে শেষহারা সোঁতা। পায়ে পায়ে
শাড়ি ঝুমঝুম বাজে, আগে ফুল পিছে ফুল একলা দুজন···

কমলেশ চক্রবর্তী

আত্মহত্যা পুরাণ : যৌবন

১. কে আমার শত্রু হবে চোখের আড়াল করবে না।
কখনো আড়ালে পলাতে পারবো কিনা
এই ভাবনায় দিন শুরু হবে :
ট্রামে বাসে ঘুরবো দুপুরে রোদে
বিকেলে ছায়ার আশ্রয়ের খোঁজে যাবো অকস্মাৎ

ক্যাথিড্রাল রোডের পাশের রাস্তায় পা ফেলে
বিকেলের ঘাসে পা ডুবিয়ে বসতে নিয়েই
হয় দৃশ্যমান
কয়টি সবুজ পরীর অমল নৃত্য

ঘুরে ঘুরে যেন সৌরজাগতিক
পা ফেলছে এখানে ওখানে বুকে
দৃষ্টির সম্মুখে

পরীরাই কখনো অলীক নয়
কারো বোন কারো কন্যা যে কোনো ইন্দ্রিয়জ সাহচর্য
বিষণ্ণ অথবা কল্লোলিত প্রভাতে
গঙ্গায় নৌকায় নিঃসঙ্গ হ'লে
পরীরাও কখনো অলীক নয়

২. সেদিন দুপুরে তূণে তীর ছিলো
বর্ম এঁটে দাঁড়ালাম শত্রুর সম্মুখে
কাতারে কাতারে পরীদের হত্যা করি
"হত্যা" অপসৃয়মান এই শব্দ
সবুজ হলুদ লাল নীল অথবা মেরুণ
কারো ওষ্ঠে বাদামি তিল
কারো বাহুমূল অনাবৃত দিগন্ত ছুঁয়েছে
কেউ মৃদু হেসে ঘাসের ডগায়
ফড়িঙের মতো অনায়াসে
মিলায় দিগন্তে
কেউ কাছে ব'সে তূণ নিয়ে খেলা করে
হাসে মৃত পরীদের আলস্য শয়নে

কে তবে দেখবে সঙ্গমের পরিতৃপ্তি
যদি না শত্রুর মতো
প্রজননে কিংবা আত্মহননে সমতুল
আনন্দিত দাঁড়ায় বৃক্ষীর মতো;
ঘাসে দু'পা ডুবিয়ে নির্ভার

৩. রক্তচোষা রক্তচোষা
রক্তে রাঙে ভীষণভীমা
পায় না খুঁজে অলীক সীমা

রক্তচোষা রক্তচোষা
দুর্বিনিত হত্যাকারী
সবুজ নীলে অহঙ্কারী

রক্তচোষা রক্তচোষা
পরীর দলে বংশীবাদক
আয়ুষ্মান সে দীপ্রঘাতক

রক্তচোষা রক্তচোষা
ঘাগরা উঁচু পরীর বেণী
বৃক্ষমূলে পা ফেলেনি

অহংকারী হত্যাকারী
বংশীবাদক গা-জোয়াড়ি
পরীর দেশে পা-টলেনি
অন্ধকারের শিরোমণি
রক্তচোষা রক্তচোষা

৪. তা ব'লে ডালিম ফলে স্তনের আঘ্রাণ
ক্ষীয়মাণ
মরদেহ অনেক ঋতুর পাবে আস্বাদন
পুনঃপুন একই সংখ্যা ক্রমশগণন
যেমন আত্মিক দুর্বলতা ব'লে বিবেচিত
অনুরূপ ভীত নিরক্ত প্রান্তরে
আচাভুয়া ভৌতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হ'লে

ভূত ভবিষ্যৎ অন্ধকার
স্মৃতি খেলা করে কখনো করে না পরিহার
বশংবদ আত্মজ সারল্যের তরুণ প্রতিম
পাতার উপর পড়েছিল শৈশবের হিম :
ঘুম ভেঙ্গে দেখি সরষে ক্ষেতের হলুদ ফুলের ভিতর
খেলা করে সমকামী রাখাল বালক
জাতিস্মর বালকেরা খালছুটে নল এলে তরল প্লাবনে
মাছেদের ভালোবেসে কাটায় বিকাল ফলবতী বনে
কখনো সবুজ চুলের ভীষণ ঊর্ণাজালে
এ-ওকে আঁকড়ে ধরে যাকে পায় বিবস্ত্র নাগালে

একাকী কাটে না শৈশবের দিন
বালক বালিকা প্রণয়প্রমত্ত
গ্রামান্তরে স্টিমারের বাঁশী শুনে
ডালিম গাছের ডালে নৌকো বাঁধে
পাকা ডালিমের ঘ্রাণ অদেখা স্বপ্নের মতো
আসে-যায় কখনো সন্ধ্যায় কখনো দুপুরে
ডালিম তলায় তখনি কৈশোর হ'তে পারে আবির্ভূত

অথচ কৈশোর এলে নিঃসঙ্গ মনে হবে
মনে হবে দীর্ণ হ'য়ে যাই মনে হবে আর্ত

সন্ধ্যামালতীর মতো
স্বপ্নের ভেতরে পায় না সন্ধান জীবনের
অতীতের ঘ্রাণ
নৌকো ভেড়ে অজানা প্রদেশে
কুল-কাঁটালিচাঁপার পোড়ো ভিটেয় বিকেলে

৫. জলপুলিশে করলো তাড়া
মাঝিমল্লা উঠলো হেঁকে
ইজারাদার জলের ভাড়া
জেনে কিন্তু দেয়নি তাকে

ডালিম ফুলের গন্ধটাকে
কার সে মালি ফেললো ঢেলে
জলপুলিশে গন্ধ পেলে
মোক্ষ ছেড়ে ধরবে তাকে

মাতাল নৌকো ঘূর্ণিটানে
পাতাল মুখে লাফিয়ে যায়
মাঝিমাল্লার সান্ধ্য গানে
জলপুলিশে বাজনা বাজায়
মধ্যরাত্রে সুতরাং শুনে ঘণ্টাধ্বনি
সচকিত বারংবার
জেগে উঠে সেই ভাবনায় তখনি

বিপদের গন্ধ পাই জানি আপনার
স্মৃতি যা নিয়ে ছিলাম—আচম্বিতে
তাই আনে গ্রাস করে কৃপণ আমাকে
ঢেউ ওঠে ঢেউ ভাঙে তরণীতে
আবর্তিত তটিনীর বাঁকে

বেণুর সশব্দ প্রতিধ্বনি
প্রান্তর ছুঁয়েছে বিষণ্ণ বিকালে
পলায় পরীর দল লজ্জিত স্বৈরিণী
জয়টীকা জ্বলে স্বল্পগ্রাস কামুকের কপালে

কখনো মুহূর্তে ঘোলাজলে রাজহাঁস
পথ ভুলে
পথ ভুলে
এখানে ওখানে চঞ্চুর আঘাতে বন্দিনীর ত্রাস
ছড়ায় সরোষে বেণুবাদকের ক্লান্ত মর্মমূলে ॥

কালীকৃষ্ণ গুহ

তিনটি পাতা

এখনি ঘুমিয়ে পড়তে হবে।
কিন্তু তার আগে দেখে নিই তিনটি পাতা, বড়ো বড়ো তিনটি পাতা, যা
পাশাপাশি উড়ে আসছে আজ।

এই শরতে উড়ে আসছে তিনটি পাতা, মন্থর, যা বহন করে
চিত্রকরের তিক্ত ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা।

ঘুমিয়ে পড়ার পর মাথার কাছে প'ড়ে থাকবে চশমা ও
খবরের কাগজ, আর
বাইরে, আকাশে, তিনটি পাতা উড়তে থাকবে।

উজ্জ্বল দিনের কথা ভেবে

হয়তো এক উজ্জ্বল দিন আসছে মানুষের জন্য।

সেই দিনের কথা ভেবেই কাজ ক'রে চলেছে ক্লান্ত অসলগ্ন মানুষ।
তারা গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ড্রাম—
নিজের হাতে তৈরী করছে নোংরা কালো ধোঁয়া
মেশিন মুছে রাখছে।

লণ্ঠন জেলে কবিতা লিখছে অ অভুক্ত ম্লান তরুণ কবি।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এই মৌন ঘিরে

এখানে দাঁড়িয়ে আছি স্থির,
ওখানে আমার বসে-থাকা
চুপচাপ।

তবুও তো নিদ্রাহীন কেউ
আমাকে দেখিয়ে বলছে, লোকটার উদ্দেশ্য কিছু আছে-
লোকটা ভাড়। কেউ বলছে, ধার্মিক নিশ্চয়।
কেউ বলছে, নাস্তিক নাস্তিক।
কেউ বলছে, খুনী কিংবা জেল-পলাতক।

গল্প ও গুজব
জমে ওঠে, সুতীব্র সন্দেহ, এই মৌন ঘিরে
তীব্র ও বাঙ্ময়।

আমি স্থির এবং পাথর।

মৃণাল দত্ত

টেলিফোন

সারাদিন কার বাড়িতে টেলিফোন বেজে যায়
বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ে, ফের বাজে, থেমে যায়, ফের···
কে যে ফোন করে, কাকে ফোন করে, কেন করে ?
ফোন বেজে যায়, বাজতে বাজতে, ক্রমাগত বাজতে বাজতে
একসময় থেমে যায় নিজে থেকে ।
এরকম হিম-শীতল নিস্তব্ধ মৃত্যুর মতো ভয়াল শূন্যতা
আগে কখনো আসেনি ।
জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, পাশের বাড়ির
নিঃশব্দ শূন্যতা
এবং সংলগ্ন একটি ধূসর জারুলগাছ, পত্রহীন ।

কৃষ্ণা বসু

আমাদের ছোট ছেঁড়া ছাদের ওপর

সমুদ্রের কাছে যেতে হলে সমুদ্রেরই কাছে যেতে হয় !
অরণ্য তো সরতে সরতে অনাত্মীয় হয়ে গেছে সেদিন সকালে,
সমতল জীবনের মধ্যে কোনো পাহাড়ের প্রতিশ্রুতি নেই,
শুধু আকাশ রয়েছে জেগে সবত্র এখানে,
এই মহানগরের দীনতম বস্তিরও সামনে এসে সে দাঁড়ায়,
কখনো বা মাঝরাতে লোডশেডিংএর মধ্যে জেগে ওঠে তুমুল জ্যোৎস্নায়
পাহাড় গিয়েছে ভুল স্বপ্নের দিকে চলে,
এখন হে মহাকাশ,
তুমি ত তোমার বুকের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া

বিদেশী রূপোলি পাখীর মতন বাতাস জাহাজ
আমাদের এই ছেঁড়া ময়লা দিনের ওপর
কিছুটা বিস্তার নিয়ে এসো আর রঙিন প্রস্তাব।
মহাজীবনের কোনো ছবি, হে আকাশ,
তোমার সমীপে যেন ভেসে ওঠে ভোরবেলা,
কিম্বা কোনো অমর দুপুরে
যে যেখানে থাক্, শুধু আমাদের ছোট ছেঁড়া
ছাদের ওপর তুমি জেগে থেকো তেত্রিশ বছর।

অমিতাভ গুপ্ত

বাগর্থ

আমারই লেখা শেষ কবিতাটির কাছে একটু নিচু হ'য়ে
কি যেন খুঁজলেন
হঠাৎ ভগবান। তখন মাঝরাত, তখন আমি একা
তখন পৃথিবীর ক্ষুব্ধ আঁধারের তিমিরে তমসার কান্না শোনা যায়

তিনি কি দেখলেন? আমার ব্যবহৃত ভাষা ও ছন্দের গভীরে কতখানি
রয়েছে প্রতিরোধ?

ক্লান্তি

কোনো কোনো প্রার্থনার ভাষা নেই। বোবামানুষের
মতো কিছু অন্ধকার বুকে তুলে নিয়ে
অন্ধকারে ফিরে যেতে হয়

একটি গভীর চোখ চেয়ে থাকে তবু প্রত্যাশায়
মন্দিরের মতো স্নিগ্ধ রূপময় মুখে
ঈশ্বরের আর্তি জেগে ওঠে।

পাখি

'শান্তি শান্তি' একটি দোয়েল
গান গেয়ে গেল
জানালার কাছে এসে

আমার জানালা বাগানের দিকে খোলা।

অশোক দত্তচৌধুরী

ফেরা

কলমের কাছে ফিরে যেতে ভয় হয়
কেননা মানুষ নেই, এই চিতা শুয়োরের জঙ্গলে আমি একা প'ড়ে আছি।
কালি তার তন্তুজাল বুনে, তবে কার কথা লিখে যাবে?
দেখি, আশশ্যাওড়ার ঝোপ থেকে নামে অন্ধকার, চাপচাপ অন্ধকার।
আর, শুধু শোনা যায় ঝিঁঝি ডাক—এক সান্ধ্যভাষা।

মনে পড়ে আজ, নন্দীগ্রামের কোনো ভাঙা ঘর, দূরে প'ড়ে-থাকা ইটপাঁজা।
কয়েকশো বছর আগে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো
আমাদের সে-ই লাল ছোটো বাড়ি।

সাক্ষাৎকার: বোরিস পাস্তেরনাক

[ওলগা কারলিসলে]

ভাষান্তর : কমলেশ চক্রবর্তী

গত জানুয়ারী মাসে মস্কো পৌছানোর দিনদশেক পরে মনস্থির করলাম বোরিস পাস্তেরনাকের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। আমি ছোটবেলা থেকেই ওঁর কবিতা পছন্দ করতাম। তখন থেকেই আমার বাবামার কাছে তাঁর কথা অনেক শুনেছিলাম। ওঁদের তিনজনের পরিচয় অনেকদিনের।

আমার সঙ্গে ছোটোখাটো কিছু উপহার ও ওঁর ভক্তদের পাঠানো নানা সংবাদ, ওঁকে দেবার মতো ছিল। কিন্তু মস্কো পৌছে জানলাম পাস্তেরনাকের কোনো টেলিফোন নেই। খুব বেশি নৈর্ব্যক্তিক হবে ভেবে ওঁকে কোনো চিরকুট পাঠানোর ভাবনাও ত্যাগ করলাম। তিনি সম্ভবত প্রভূত চিঠিপত্র প্রতিদিন পেয়ে থাকেন, ফলে তাঁর পক্ষে দেখা করা সম্ভব নয়-ধরণের ছাপানো গৎ অধিকাংশ পত্রের উত্তরে ব্যবহার করাই স্বাভাবিক। এমন একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে পূর্বে খবর না পাঠিয়ে দেখা করতে যাওয়ার জন্য সাধারণত অনেক বেগ পেতে হয়। একটু ভয়ও ছিলো—এই পরিণত বয়সে হয়ত বা পাস্তেরনাক তাঁর কবিতার চরিত্র—কাব্যিক, আবেগময়তা, সর্বোপরি যৌবনধর্মে তিক্ততা—তাঁর জীবনে রক্ষা করতে পারেন নি।

আমার পিতামাতা দুজনেই বলেছিলেন, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাবার কিছু আগে যখন তাঁরা শেষবার পাস্তেরনাককে দেখেন তখন তিনি রুশীয় লেখকদের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রত্যেক রবিবার নিজের গৃহের দ্বার-দর্শনোচ্ছু-ভক্তদের জন্য অবারিত রাখতেন। এই ঐতিহ্য যে সব রুশীয় লেখক বিদেশে বসবাস করেন মূলত তাঁরাও মেনে চলেন। আমি যখন বালিকা বয়েসে প্যারীতে থাকতেম, মনে পড়ে, রবিবারগুলোর অধিকাংশ বিকেলে লেখক রেমিনোভ ও প্রখ্যাত দার্শনিক বেরদিয়ায়েভ-এর গৃহে পিতামাতার সঙ্গে গিয়েছি।

মস্কোতে আসার পর দ্বিতীয় রবিবার আমি হঠাৎ ঠিক করলাম যে পেরেডেলকিনো যাবো। সে দিনটা ছিলো উজ্জ্বল ঝলমলে। শহরের মধ্যিখানে আমি যেখানে থাকতাম সদ্য ঝরে-পড়া তুষারের উপরিতল ঝিকমিক করছিলো ক্রেমলিনের স্বর্ণ গম্বুজের আভায়। রাজপথ দৃশ্য-উপভোগকারীদের সমাগমে পূর্ণ। শহরের বাইরে থেকে যারা এসেছে তারা চাষীদের মতো দলবেঁধে হাঁটছে ক্রেমলিনের দিকে। অনেকেরই হাতে লজ্জাবতীলতা—কেউ কেউ বা নিয়েছে একটা পুরো ডাল। শীতের রবিবারগুলোয় মাস্কোতে প্রচুর লজ্জাবতীলতা আমদানী করা হয়। রুশীয়রা এই লতা ক্রয় করে কখনো অন্যকে উপহার দেবে ব'লে, কখনো শুধু নিজেই হাতে নিয়ে বেড়াতে যাবে, ব'লে—যেন এই দিনের পবিত্রতার চিহ্ন ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যদিও আমি জ্ঞাত ছিলাম যে একটা বিদ্যুতবাহী রেলগাড়ি মস্কোর একটু বাইরে কিয়েভ রেলস্টেশন থেকে ছাড়ে তবু ঠিক করলাম একটা ট্যাক্সিই ভাড়া নিয়ে যাবো পেরেডেলকিনো। হঠাৎ কেমন যেন সেখানে দ্রুত পৌছুবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে উঠলাম। যদিও ওয়াকিবহাল অনেক মস্কোবাসী আমাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন এই বলে যে বিদেশী দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতে খুবই অনিচ্ছুক। মনে মনে অবশ্য ঠিক ক'রেছিলাম, ওঁকে খবরগুলো পৌছে দিয়ে এবং সম্ভবত একবার তার করমর্দন করেই ফেরার পথ ধরবো।

আমার ট্যাক্সির চালক—যিনি বলতে গেলে প্রায় যুবক, বরং চেহারায় পৃথিবীর অন্য সব নগরীর বৈশিষ্ট্যহীন ট্যাক্সি চালকদেরই অনুরূপ—আমাকে বোঝালেন যে তিনি পেরেডেলকিনের পথ বেশ ভালোকরেই জানেন। স্থানটি কিয়েভ রাজপথ থেকে ৩০ কিলোমিটার মাত্র দূরে। ভাড়া পড়বে ৩০ রুবোলের মতো। এমন একটা রৌদ্রঝলমলে দিনে আমি যে এই পথটা গাড়িচেপে যাবার ইচ্ছে করছি তা ওঁর কাছে বেশ স্বাভাবিক ব'লেই মনে হয়েছে।

কিন্তু খুব শিগগিরই আমরা পথ হারিয়ে ফেলায় প্রমাণ হ'লো গাড়ির চালক রাস্তা চেনার কথাটা পুরো দম্ভ ক'রে বলেছেন। চারটে গাড়ি চলার উপযোগী রাজপথ দিয়ে আমরা বেশ মোটামুটি দ্রুত গতিতে চলছিলাম। রাস্তায় গতি ব্যাহত হ'লো না বরফ জমার ফলে। পথস্পর্শে কোনো ছেলের পাম্প বা নামের কোনো ফলকও দেখতে পেলেম না। মাঝে মাঝে যদিও বা অস্পষ্টভাবে

রাস্তার নাম লেখা ফলক পাওয়া গেল কিন্তু সে সব থেকে পেরেডেলকিনোর কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব হ'ল না তাই পথে যেখানেই কোনো পথচারীর দেখা পেলাম গাড়ি থামিয়ে তার কাছে পথের সন্ধান চাইছিলাম। প্রত্যেকেই মনে হ'ল অত্যন্ত সহৃদয় ও সাহায্যের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু ওদের মধ্যে কাউকে পেরেডেলকিনোর নামের সঙ্গে পরিচিত ব'লে মনে হয় না। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধ'রে সীমাহীন শুভ্র মাঠের মধ্য দিয়ে একটা কাচা, বরফাচ্ছাদিত পথ ধ'রে চললাম। অবশেষে পৌছানো গেল একটা গ্রামে। গ্রামটা যেন পুরনো যুগ থেকে উঠে এসেছে। মস্কোর উপান্তে যে অসংখ্য নূতন যৌথ বসতবাড়িগুলো দৃশ্যমান, এই গ্রামের রাস্তার দুপাশে নিচু, পুরনো ধাচের কাঠের কুঠিরগুলো তার ঠিক বিপরীত। একটাঘোড়ায়-টানা বরফে চলার গাড়ি পাশ দিয়ে চ'লে গেল। ছোটো একটা কাঠের গীর্জের সামনে একদল মহিলা মাথায় রুমাল বাধা। জানা গেল আমরা পেরেডেলকিনোর খুব কাছাকাছি পৌছে গেছি। ঘন চিরসবুজ বনের মধ্যে দিয়ে দশ মিনিট একটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ি চলার পর আমরা হঠাৎ পাস্তেরনাকের গৃহের সম্মুখে এসে পৌছে গেলাম। আমি এই গৃহটি নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা ছবিতে দেখেছি। সেটাই সহসা এখন আমার ডানদিকে আবির্ভূত হ'ল। ধূসর, ঘুলঘুলি ধরণের জানালা, ফার বৃক্ষের সারির পশ্চাতপটে ঢালু জমিতে অবস্থিত গৃহটি। যে রাস্তা দিয়ে আমরা এই শহরে পৌছেছি বাড়িটি থেকে তা স্পষ্ট দেখা যায়।

পেরেডেলকিনো একটু অগোছালো ছোট্ট শহর। দেখে মনে হয় অতিথি-পরায়ন ও রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নের হাসিতে উদ্ভাসিত। এখানেই নানা লেখক ও শিল্পী তাঁদের বাসের জন্য নির্ধারিত গৃহে বছরের পর বছর বসবাস করছেন। সোভিয়েট লেখক সমিতির দ্বারা পরিচালিত এই উপনিবেশে এমন একটি বিশ্রাম গৃহ আছে যা মূলতঃ লেখক অথবা সাংবাদিকদের জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু শহরের বেশির ভাগ ভূমিই আজো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের সব কারিগর কিংবা চাষীদের অধিকারভুক্ত। ফলে শহরের কোথাও তেমন কোনো সাহিত্যে ছাপ লক্ষিত হয় না।

স্বনামধন্য সাহিত্য সমালোচক ও শিশুসাহিত্যিক চোকোভস্কি একটা বেশ আরামদায়ক ও আতিথ্যে উত্তাপিত গৃহে বাস করেন। তাঁর এই গৃহে

রয়েছে অজস্র বই। তিনি শহরের ছেলেমেয়েদের জন্ত একটা পাঠাগার পরিচালনা করেন এখন থেকেই। পাস্তেরনাকের প্রতিবেশী হলেন বর্তমান কালের রুশীয় উপন্যাস লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত, কনস্টানটিন ফেদিন। তিনি আসলে এখন লেখক সমিতির প্রধান কার্য-নির্বাহক। এই কাজটা আলেকজাণ্ডার ফাদিয়েভই করতেন ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। তিনিও এখানেই বাস করেছেন আমৃত্যু। পরে পাস্তেরনাক আমাকে আইজাক বাবেলের বাসগৃহটিও দেখালেন। ১৯৩০-এ তাঁকে বন্দী করে নেওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই বাস করেছেন, কিন্তু পরে আর কোনো দিন এ গৃহে ফিরে আসেন নি।

পাস্তেরনাকের বাসগৃহটি খুব সুন্দর একটা বাঁকা মেঠো পথের ধারে—যে পথ টিলার উপর থেকে নেমে গেছে ছোট্টো তটিনীটির ধার পর্যন্ত। এই আলোকিত অপরাহ্নে টিলার ওপরটা ভ'রে আছে স্কী ও শ্লেজগাড়ি ভর্তি গুচ্ছগুচ্ছ বাচ্ছা ভালুকের মতো শহরের শিশুর দলে। গৃহের উল্টোদিকে রাস্তার ওপরে একটা বৃহৎ বেড়া দেওয়া মাঠ—যা আসলে গ্রীষ্মে যৌথ চাষ-আবাদের ক্ষেত্র। এখন একটা টিলার উপর ছোট্টো কবরখানা ভিন্ন পুরো মাঠটাই বরফে সাদা হ'য়ে আছে। মনে হয় শাগালের কোনো চিত্রের পটভূমি। কবরগুলো সব উজ্জ্বল নীল রঙের কাঠের বেড়ায় ঘেরা, ক্রুশগুলো কেমন হেলানো, আর বরফের উপর পুঁতে রাখা হয়েছে অজস্র গোলাপী ও লাল কাগজের ফুল। কবরখানাটাও যেন হাস্যমুখর।

গৃহটির বারান্দা দেখে মনে হয় যেন চল্লিশ বছরের পুরনো মার্কিন কাঠামোর গৃহ, কিন্তু যে ফার বনের সম্মুখে গৃহটি তাকে স্পষ্টই রুশীয় আবাস হিসেবে চিনতে পারা যায়। ফারগাছগুলো গায়ে গা লাগিয়ে জন্মায় ব'লে শহরটা ঘিরে যে সামান্ত ফার গাছের আবরণ তাতেই গভীর অরণ্যের প্রতিভাস।

চালকের প্রাপ্য মিটিয়ে অত্যন্ত দ্বিধা নিয়ে সদর দরোজাটা ঠেলে খুললাম। গেটটা রাস্তা থেকে বাগানটাকে পৃথক ক'রে রেখেছে, তা পেরিয়ে সোজা হেঁটে গেলাম অন্ধকার গৃহের দিকে। ছোটো বারান্দার একপাশে একটা দরোজা তার উপর পেরেক দিয়ে আঁটা মুছে যাওয়া ফলকে ইংরিজিতে লেখা আছে: "আমি কাজে ব্যস্ত। আমার পক্ষে এখন কাউকে অভ্যর্থনা করা সম্ভব নয়; দয়া

ক'রে ফিরে যান।" এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরই ঠিক ক'রে ফেললাম, এই নির্দেশ মানব না—দুই কারণে, প্রথমত এই নির্দেশনামা দেখে মনে হয় অত্যন্ত পুরাতন; দ্বিতীয়ত, আমার হাতে কয়েকটা ছোটো ছোটা উপহার সামগ্রীর মোড়ক। দরোজায় টোকা দিলাম, এবং প্রায় তৎমুহূর্তেই দরোজাটা খুলে গেল। খুললেন, পাস্তেরনাক স্বয়ং।

শিরে আস্ত্রাকান প্রদেশের মেষচর্মের টুপি। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো রূপবান তিনি। চোয়ালের হাড় একটু উঁচু, কালো চোখ, লোমওয়ালা টুপি মাথায় তাঁকে দেখে মনে হ'ল যেন এইমাত্র রুশীয় উপকথা থেকে একটি চরিত্র নেমে এলেন। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের অশেষ ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠার শেষে আমি যেন কেমন নিশ্চিন্তি অনুভব করলাম। মনে হ'ল যেন পাস্তেরনাকের সঙ্গে দেখা নাও হ'তে পারে—এ কথাটা কখনো বিশ্বাস করিনি।

আমি আমার পিতার পোষাকি নাম ব্যবহার করে বললাম, আমি ভাদিম লিওনিডোভিচ-এর কন্যা, আমার নাম ওলগা আন্দ্রিয়েভ। পিতার এই নামটি আসলে ওঁর এবং ওঁর পিতার প্রথম নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঠিক করা। ওঁর পিতা লিওনিড ছোটোগল্প ও নাটক রচয়িতা, তাঁর নাটকের নাম "হি হু গেট্স স্ল্যাপ্‌ট" এবং "দি সেভেন হু ওয়ার হ্যাঙ্গড" ইত্যাদি। আন্দ্রিয়েভ নাম হিসেবে রুশদেশে সুপরিচিত।

আমি যে বিদেশ থেকে এসেছি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, এ কথাটা অনুধাবন করতে পাস্তেরনাকের এক মিনিট সময় লাগলো। নিজের দুহাতে আমার হাত নিয়ে উনি আমাকে অত্যন্ত উত্তাপময় সম্ভাষণ জানালেন। জিগগেস করলেন, আমার মায়ের স্বাস্থ্য বিষয়ে, পিতার লেখা বিষয়ে এবং শেষ কবে আমি পারী গিয়েছিলাম সব সময় নিরীক্ষণ করছিলেন আমার মুখ যদি তা'তে পারিবারিক কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি কারো সঙ্গে দেখা করতে বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যদি আমি আর এক মুহূর্তও দেরি ক'রে পৌঁছুতাম তবে তাঁকে পেতাম না। তিনি প্রথম যেখানে যাবেন—লেখকসমিতির দপ্তর পর্যন্ত—আমাকে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে বললেন।

যতক্ষণ পাস্তেরনাক প্রস্তুত হচ্ছিলেন বেরুবার জন্য ততক্ষণ আমি যে সামান্য সাজানো খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেটি ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ

পেলাম। যে মুহূর্তে আমি এই গৃহে পা রেখেছি তখনি আমার গতকাল মস্কোতে দেখা লিও তলস্তয়ের আবাসের সঙ্গে এর মিল আমাকে চমকিত করেছে। দুটি গৃহের আবহাওয়াতেই এমনভাবে যুক্ত হয়েছে অনাড়ম্বরতা ও অতিথিপ্রিয়তা যে আমার মনে হ'ল এটি নিশ্চয়ই উনবিংশ শতকের রুশীয় বুদ্ধিজীবীদের গৃহলক্ষণ। আসবাবপত্র আরামদায়ক, কিন্তু প্রাচীন ও দম্ভহীন। ঘরগুলো দেখলে মনে হয় অকেতাদুরস্ত আমোদ-প্রমোদ, শিশুদের সমাবেশ, পড়ুয়ামানুষের জীবনযাপনের জন্য আদর্শ ঘর। যদিও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সাধারণ, তবু তলস্তয়ের গৃহ পাস্তেরনাকের গৃহের তুলনায় বেশ বৃহৎ ও জটিল, কিন্তু সৌষ্ঠব বিষয়ে অনীহায় অথবা তা প্রকাশে অনিচ্ছা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান।

সাধারণত, পাস্তেরনাকের গৃহে প্রবেশ করতে হ'লে পাকশালার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আর সেখানে জামাকাপড় থেকে ঝুরো বরফ ঝেড়ে দেবার জন্য রয়েছে গৃহকর্তার ছোট্টোখাটো সদাহাস্যময় মাঝারি বয়সের পাচকটি। এর পরেই ভোজনকক্ষ যার খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় জিরেনিয়াম গাছ। দেয়ালে লেখকের চিত্রশিল্পী পিতা লিওনিড পাস্তেরনাকের কাঠকয়লায় আঁকা কিছু চিত্র। কিছু স্থিরচিত্র, কিছু প্রতিকৃতি। তার মধ্যে আছে, টলস্তয়, গোর্কি, স্ক্রিয়াবিন, রাচমানিনভ। আছে বোরিস পাস্তেরনাক, তাঁর ভ্রাতা ও ভগ্নীদের শৈশব চিত্র, কিছু মহিলা—যাঁদের মাথায় মস্ত টুপি, মুখ পাতলা ঘোমটায় আচ্ছাদিত……সবটা মিলিয়ে পাস্তেরনাকের ছেলেবেলার নানা স্মৃতি, তাঁর কবিতার কৈশোর প্রেম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাস্তেরনাক বেরুবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এলেন। বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোকে আমরা বেরিয়ে এলাম। গৃহের পেছনদিকের চিরসবুজ কুঞ্জপথে আমার জুতোয় ঢুকে যেতে থাকা বেশ পুরু বরফের উপর দিয়ে আমরা হাঁটতে সুরু করলাম।

একটু পরেই আমরা এসে পৌঁছুলাম জনাকীর্ণ এক পথে—যে পথে মাঝে-মাঝে পিচ্ছিল বরফের আস্তরণ থাকা সত্ত্বেও হাঁটার পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক ব'লে মনে হ'ল। পাস্তেরনাক দীর্ঘ ও নড়বড়ভাবে পা ফেলছিলেন। কেবলমাত্র বিপদ্জনক স্থানগুলোতেই তিনি আমার বাহু ধরছিলেন, তাছাড়া অন্যসময় মনযোগ ছিল কেবল আলাপচারিতায়। রুশীয়

জীবনে হাঁটার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে—যেমন রয়েছে চা পানের কিংবা দীর্ঘ দার্শনিক কথপোকথনের—যা তিনিও পছন্দ করতেন। লেখকসমিতির দপ্তরে পৌঁছুবার জন্য যে পথটা আমরা বেছে নিয়েছিলাম তা যে অত্যন্ত ঘুরপথ তা'তে কোনোই সন্দেহ নেই। আমাদের এই আলাপময় পদচারণা প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় নিল। যেহেতু আমি উল্লেখ করেছিলাম যে আমার এবং অনেকেরই মতে ড. জিভাগো ইংরিজিতে প্রথম অনুবাদিত হয়েছে তাই তিনি প্রথমেই অনুবাদ কর্মের বিষয়ে আলোচনায় রত হলেন। মাঝে মাঝে অবশ্যই আলোচনা থামিয়ে জিগগেস করছিলেন ফরাসী ও মার্কিন রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক আবহাওয়ার কথা। বললেন, তিনি খুবই কম সংবাদপত্র পাঠ করেন। "যদি না আমি পেন্সিল কাটতে বসি ও কর্তিত অংশগুলো কোনো সংবাদপত্রের উপর জড়ো করতে চাই। এমনি করেই আমি গত হেমন্তে জানতে পেরেছিলাম আলজিরিয়ায় দ্য গলের বিরুদ্ধে একটা ছোটোখাটো বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিলো ও তার পরিণতি হিসেবে স্যুস্তেলে বিতাড়িত হয়েছিল। স্যুস্তেলে বিতাড়িত হয়েছিল।" তিনি পুনরাবৃত্তি করছেন, দ্য গলের সিদ্ধান্তে খুশি হ'য়ে এবং শব্দের অনুপ্রাসের মজায়। কিন্তু আসলে মনে হ'ল বিদেশের সাহিত্যজীবন সম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য ভাবে ওয়াকিবহাল এ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসাও প্রখর।

প্রথম থেকেই পাস্তেরনাকের কথ্যভাষা আর তাঁর কবিতার মধ্যে-শব্দের অনুপ্রাস ও অসাধারণ চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাযুজ্য আমাকে যেমন মোহিত করেছিল তেমনি বিস্ময়াবিষ্টও হয়েছিলাম। শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে দিচ্ছিলেন সঙ্গীতে যেমন হয়—অথচ কখনো মনে হয় না প্রয়াশক্লিষ্ট অথবা শব্দের প্রয়োজনে যথার্থের অবহেলা হচ্ছে। যিনি রুশীয় ভাষায় তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত তাঁর পক্ষে পাস্তেরনাকের সঙ্গে আলাপচারিতা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা মনে হবে। শব্দ ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা এতোই প্রবল যে আলাপচারিতার সময় মনে হয় যেন তাঁর কোনো কবিতাই দীর্ঘতর করছেন, যেন অতিক্রত প্রক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধ, শব্দের ও চিত্রকল্পের ক্রমশ্বয় ঢেউ সঙ্গীতের উচ্চগ্রাম মূর্চ্ছনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

পরে তাঁর ভাষার সাঙ্গীতিকতা বিষয়ে তাঁকে বললাম। তিনি বললেন,

"কী লেখায় কী বচনে শব্দের সঙ্গীত তো কেবলমাত্র শব্দ নয়। কেবলমাত্র স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণেই শব্দের জন্ম নয়। শব্দের সঙ্গীতের জন্ম আসলে কথা ও নিহিতার্থের দ্যুতিময় মিলন থেকে। এবং নিহিতার্থ, বিষয়—অবশ্যই পূর্বগামী হবে।"

যতবার ভাবছিলাম আমি একজন সত্তর বৎসর বয়সের মানুষের সঙ্গে কথা বলছি ততই কেমন আশ্চর্য লাগছিল—কারণ এই বয়সেও পাস্তেরনাক দেখতে যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে যুবক সদৃশ তেমনি স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত। তবু কোথায় যেন কিছু একটা অবিশ্বাস্য, একটা নিষেধ তাঁর 'যৌবনের' সঙ্গে মিশে আছে—জানি না সে বস্তুটিই শিল্প কিনা?—আর তাই এই মানুষটিকে সত্তর বছরেও এক যৌবনদীপ্তি দান করেছে। তাঁর চলনবলন—তাঁর হাতের প্রক্ষেপ, মাথাটা পেছনের দিকে ঈষৎ হেলনোতে—পূর্ণযৌবনের প্রকাশই দৃশ্যমান হয়। তাঁর বন্ধু মহিলা কবি মারিনা টিস্‌ভেটায়েভা লিখেছিলেন, "পাস্তেরনাক দেখতে যুগপৎ একজন আরব ও তার অশ্বের মতো।" সত্যিই তাঁর চাপা গাত্রবর্ণ ও রূপদী শারীরিক গঠন অন্তর মুখাবয়ব তাঁকে আরবদের অনুরূপ ক'রে তুলেছিল। কোনো কোনে মুহূর্তে তিনি যেন হঠাৎ তাঁর অসাধারণ মুখমণ্ডল, তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিঘাত বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতেন। মুহূর্তে যেন তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতেন, বাঁকা বাদামী চোখ অর্ধনিমিলিত হ'তো, মাথাটা একটু হেলিয়ে দিলেই কেমন যেন তাঁকে দেখে মনে হ'তো আরব অশ্বের প্রতিকৃতিস্বরূপ।

মস্কোতে কয়েকজন লেখক যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পাস্তেরনাকে সঙ্গে পরিচিত নন—আমাকে বলেছিলেন– পাস্তেরনাক নাকি জনশ্রুতি অনুযায়ী আত্মপ্রতিমার প্রেমে মত্ত। তখন কিন্তু আমি মস্কোতে অনেক প্রকার পরস্পরবিরোধী জনশ্রুতি শুনেছি: সবটা মিলিয়ে পাস্তেরনাক ছিলেন এক জীবন্ত উপকথা—কিছুসংখ্যক মানুষের কাছে আদর্শজন, অন্যদের কাছে এমন মানুষ যিনি রাশিয়ার শত্রুদের কাছে নিজেকে বিক্রয় করেছেন। লেখক বা শিল্পীকুলের কাছে কিন্তু সর্ববাদিরূপে তাঁর কবিতা তর্পিত হ'তো প্রশংসা বাক্যে। ড. জিভাগোর নায়কের চরিত্রটিই আসলে সব বিতর্কের মর্মস্থল। পাস্তেরনাকের কবিতার এক পরমভক্ত অত্যন্ত মুক্ত মনের মানুষ একজন রুশীয় বহুল প্রচারিত তরুণ কবি

বলেছিলেন ড. জিভাগো সম্পর্কে, "সব নিয়ে উৎসাহহীন ঘুণে-ধরা একজন বুদ্ধিবাদী ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

আমি অবশ্য কোনো সময়ই পাস্তেরনাক যে আত্মপ্রতিমাপ্রেমী এই নিন্দাবাক্যের যথার্থতার কোনো কারণ দেখতে পাই নি। পক্ষান্তরে, তাঁকে মনে হয়েছে পারিপার্শ্বিক জন্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং তাঁর আশপাশের মানুষের পরিবর্তনশীল মানসিকতা বিষয়ে তুমুল উৎসাহী। তাঁর তুলনায় অধিক সংবেদনশীল আলাপচারীর কল্পনা করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তিনি অত্যন্ত গূঢ় রহস্যময় ভাবনাও মুহূর্তে অনুধাবন করতে সক্ষম। তাঁর সঙ্গে আলাপনে কথোপকথনের সব ভার আপনি খ'সে পড়ে। আমার পিতামাতা বিষয়ে পাস্তেরনাক নানা প্রশ্ন করলেন। যদিও তিনি জীবনে সামান্য কয়েকবার মাত্র তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, অথচ তাঁদের দুজনের বিষয়ে সব কথা, এমন কি তাঁদের নানা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভালোলাগা মন্দলাগাগুলোও স্মরণে রেখেছেন। বিস্ময়ের কথা, তিনি আমার পিতার যে কবিতাগুলো পছন্দ করতেন তা হুবহু আজও স্মরণে রেখেছেন। যে সব লেখকদের আমি চিনতাম তাঁদের কথা তিনি জানতে চাইলেন—জানতে চাইলেন যে সব রুশীয়রা পারীতে আছেন, ফরাসীদের, আমেরিকানদের কথা। মনে হ'ল মার্কিনী সাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিত করে—যদিও তিনি মাত্র কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য নামের সঙ্গেই মাত্র পরিচিত। আমি একটু পরেই বুঝতে পারলাম—তাঁকে নিজের সম্বন্ধে কথা বলানোটা বেশ কঠিন কাজ হবে।

সূর্যালোকে চলতে চলতে আমি পাস্তেরনাককে জানালাম তাঁর ড. জিভাগো পশ্চিম দেশগুলোয় বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কতখানি উৎসাহ ও প্রশংসা অর্জন করেছে—যদিও ইংরিজি ভাষান্তর তাঁর গ্রন্থের প্রতি তেমন সুবিচার করতে সক্ষম হয় নি।

"ঠিক", তিনি বললেন, "আমি এই উৎসাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং আমি এর জন্য খুবই গর্ব ও তৃপ্তি অনুভব করি। বস্তুত আমি বিদেশ থেকে নিয়ত প্রভূত পরিমানে এই সম্পর্কে চিঠি পাই। সত্যি বলতে, কখনো কখনো এই পত্রাবলীর প্রাচুর্য আমার কাছে ভারস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। এই সব পত্রের উত্তর আমাকেই দিতে হয়, তার চেয়েও বেশি এই ভাবে সীমান্তের

অপর দিকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করাও প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠে। ড. জিভাগোর ভাষান্তর বিষয়ে ওদের বিশেষ দোষারোপ করাটা ঠিক নয়। এটা আসলে ওদের ত্রুটি নয়। ওরা বস্তুত, অন্যান্য দেশের অনুবাদকদের মতোই যা বলা হয়েছে তার শৈলীর পরিবর্তে বাচ্যার্থের ভাষান্তর করতেই অভ্যস্ত। যদিও রচনাশৈলীই প্রথমত গ্রাহ্য। বস্তুত, ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদই একমাত্র অনুধাবন যোগ্য বিষয়। এখানেই প্রয়োজন কুশলীকর্মের। আধুনিক সাহিত্য, হয়তবা অনুবাদ সহন মনে হবে, তবু বলবো তার ভাষান্তর প্রতিদানহীন। তুমি বলছো, তুমি চিত্রকর। বেশ ভাষান্তর কর্ম আসলে ঠিক যেন চিত্রের কপি করার মতো ব্যাপার। ভাবো তো তুমি মালেভিচের একটি ছবির কপি করছো। একাজটা কী তোমার কাছে ক্লান্তিদায়ক মনে হবে না? এবং এই কাজটিই আসলে আমাকে করতে হবে বিখ্যাত চেক স্যুররেয়ালিস্ত লেখক নেজভাল-এর জন্য। তিনি কিন্তু আসলে নিরস লেখক নন, কিন্তু বিশ দশকের এই সব রচনা এখন অত্যন্ত পুরানো হ'য়ে গিয়েছে। এই অনুবাদকর্ম যা আমি সমাপ্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমার নিজের চিঠিপত্র রচনার কাজ আমার অনেক অনেক সময় নষ্ট করছে।"

"চিঠিপত্র পেতে কী আপনার কোনো অসুবিধা হয়?"

"মনে হয় যে সব চিঠিপত্র আমাকে পাঠানো হয় তার সবটাই আমি এখন পাই। এগুলো সংখ্যায় প্রচুর—যদিও আমি এসব চিঠিপত্র পেয়ে খুশিই হই তবু এত সংখ্যক চিঠির উত্তর দেবার বাধ্যবাধকতা কখনো কখনো আমাকে পীড়িত করে।

"বুঝতেই পার ড. জিভাগো সম্পর্কে যে সব চিঠি আমি পাই তার মধ্যে কিছু সংখ্যক অবাস্তব বিষয়ে পরিপূর্ণ। সম্প্রতি ফরাশি ভাষায় একজন চিঠি লিখছেন—ড. জিভাগো উপন্যাসটির পরিকল্পনা বিষয়ে জানতে চেয়ে। মনে হয় উপন্যাসটি ফরাশি রীতিবোধকে খণ্ডিত করছে। কী হাস্যকর প্রশ্ন—উপন্যাসে ব্যবহৃত কবিতাগুলোই তো উপন্যাসের মূল পরিকল্পনা প্রকাশ করছে। খানিকটা এই জন্যই আমি কবিতাগুলো উপন্যাসের সঙ্গে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলাম। কবিতাগুলোর অন্য কাজ হচ্ছে উপন্যাসটিকে আরো একটু বেশি অবয়ব, আরো অধিক বৈভব প্রদান করা। আবার উপন্যাসটিকে আরও

একটু বেশি প্রাণের উত্তাপ প্রদান করার জন্যই আমি ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করেছিলাম। এখন কিছু কিছু সমালোচক ঐ সব প্রতীকের আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন। অবশ্য যেমন গৃহে আগুনের চুল্লি বসানো হয় উত্তাপের প্রয়োজনে তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসের প্রতীকগুলি। এরা চাইছেন যাতে আমি আবার দায়ভাগ নিয়ে খামারি উত্তাপের চুল্লির চিমনি বেয়ে উঠি।"

"আপনি কী দি নিউ ইয়র্কার ও দি নিউ রিপাব্লিক-এ প্রকাশিত এডমাণ্ড উইলসনের ড. জিভাগোর উপর রচিত যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ দুটি পাঠ করেছেন ?"

"অবশ্যই, আমি সেগুলো অবশ্য পাঠ করেছি এবং রচনা দুটির গভীরতা ও বুদ্ধিময়তা বেশ উপভোগ করেছি। তবে তুমি নিশ্চয়ই এটা মানবে যে উপন্যাসটা নিশ্চিত ব্রহ্মবিদ্যাগত ধারায় বিচার করা ঠিক হবে না। বিশ্ব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞার অন্য কিছুই কী ব্যবহৃত হয় নি ! প্রত্যেকের উচিত অবিরাম জীবন ধারণ করা ও নিরলস রচনা কর্মে ব্যাপৃত থাকা। এর জন্য প্রয়োজন জীবনের অভিজ্ঞতার কোঠায় ক্রমাগত সঞ্চয় তেমনি সেই সঞ্চয় নিরন্তর ব্যবহার। একটা বিশেষ ধারণার প্রতি আস্থাবান হ'য়ে যাওয়ার ভাবনাটাই আমার কাছে ভয়াবহ ব'লে মনে হয়। আমাদের চারপাশে জীবন নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আমার মনে হয় প্রত্যেককে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত যাতে তদনুরূপ ভাবে সে অনুগামী হ'তে পারে—অন্তত এক দশকে একবার এই পরিবর্তনের স্রোত অনুধাবন যোগ্য। একটি বিশেষ ধারণার প্রতি মহৎ অবিচলিত নিষ্ঠা থাকার কাছে এক অজানিত ভাবনা মনে হয় এটা যেন নম্রতার অভাব মাত্র। মায়াকোভস্কি আত্মহত্যা করেছিলেন কারণ তাঁর অভিমান কখনোই যা কিছু নবতম তাঁর অন্তরের অথবা তাঁর চারপাশে ঘটছে তা মেনে নিতে পারেন নি।"

আমরা একটা দীর্ঘ নিচু কাঠের বেড়ার শেষে একটা দরোজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাস্তেরনাক থামলেন। এখানেই তাঁর যাবার কথা, আমাদের কথোপকথন তাঁকে এর মধ্যেই খানিকটা দেরি করিয়ে দিয়েছে। দুঃখের সঙ্গেই বিদায় নিলাম। কতো কিছুই না আমি সেই মুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইছিলাম। পাস্তেরনাক ছোট্টো গোরস্থানটার পেছনে, খুবই নিকটে,

পাহাড়ের ঢালুতে রেলের স্টেশনটার পথ দেখিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টারও কম সময়ে একটা ছোটো বিদ্যুৎবাহী রেলগাড়ি আমাকে মস্কো পৌঁছে দিল। "ভোরের ট্রেইন" কবিতায় পাস্তেরনাক এই রেলগাড়ির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।

আমি পরে দুবার যে পাস্তেরনাকের কাছে গিয়েছি আসলে তার স্মৃতি, দীর্ঘ সাহিত্য বিষয়ক আলাপন মিলেমিশে একটায় পরিণত হ'য়ে গেছে। আমাকে রীতিমত একটা সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ অবশ্যই তিনি দেন নি, কিন্তু মনে হয় আমার প্রশ্নগুলো শুনে যেন তিনি বেশ উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। ("এর জন্য তোমাকে যখন আমি কর্মব্যস্ত, সম্ভবত পরের হেমন্তে আবার আসতে হবে : ") খাবার সময় ভিন্ন আমরা বস্তুত আলোচনায় কোনো বাধা পাই নি। দুবারই আমার বিদায় নেবার সময় হলে পাস্তেরনাক পুরানো রুশীয় রীতি অনুযায়ী আমার করচুম্বন করতেন এবং পরের রবিবার আমাকে আসতে অনুরোধ জানাতেন।

মনে আছে, গোরস্থানের পাশ দিয়ে স্টেশনের যে সহজ পথটা তিনি দেখিয়েছিলেন সে পথে গোধূলির আবছায়ায় আমি পাস্তেরনাকের গৃহে এসেছি। হঠাৎ বাতাস উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিল—সুরু হয়েছিল তুষার ঝড়। দূরে স্টেশনের আলোর পাশ দিয়ে বর্তুল তুষারের ঢেউ উড়তে দেখেছিলাম। খুব দ্রুত অন্ধকার নেমে এলো। বাতাসের বিপরীতে চলতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। জানতাম শীতের রাশিয়ায় এই ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি জীবনে প্রথম দেখলাম এই সত্যিকারের 'মেটেল'—তুষারঝঞ্ঝা। মনে পড়লো, পৌছকিনে আর ব্লকের কবিতা। মনে হলো, পাস্তেরনাকের প্রথম জীবনে লেখা কবিতাগুলি ও ড, জিভাগোতে বর্ণিত তুষারঝড়ের কথা। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁর গৃহে পৌঁছে তাঁর উচ্ছ্বাসময় বাক্যবন্ধ যা তাঁর কাব্যেরই অনুরূপ শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলাম।

দুপুরের ভোজনের পক্ষে বেশ দেরি ক'রে আমি পৌঁছুলাম। পাস্তেরনাকের পরিবারবর্গ ইতিমধ্যে আহার স্থান ত্যাগ করেছেন, সমস্ত গৃহ যেন জনশূন্য মনে হলো। পাস্তেরনাক অনুরোধ জানাতে লাগলেন যেন আমি অন্তত কিছু খাই আর তাই পাচক খানিকটা মুগ মাংস ও ভোদকা খাবার ঘরে দিয়ে গেল। তখন প্রায় অপরাহ্ন চারটে বাজে এবং ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা

আবছায়া মনে হচ্ছিল। বাইরের জগৎসংসার থেকে যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—কোন যা তুষারপাতের ও বায়ু প্রবাহের শব্দ বাইরের জগৎ-এর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছিল। খুবই ক্ষুৎকাতর ছিলাম এবং খাদ্য যা পরিবেশিত হয়েছিল তা অত্যন্ত উপাদেয়। টেবিলের ওপিঠে বসে পাস্তেরনাক লিওনিভ আন্দ্রিয়েভ—অর্থাৎ আমার পিতামহ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সম্প্রতি তিনি ওর কিছু গল্প ফিরে পাঠ করে মোহিত হয়েছেন।" ঊনবিংশ শতকের উপকথার রাশিয়ার সব লক্ষণই তাঁর এই সব গল্প পাওয়া যায়। সেই সব বৎসরগুলো ক্রমশ আমাদের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে অথচ দূরে দৃশ্যমান বিপুলায়তন পর্বত শ্রেণীর সেই সময় আজো আমাদের মনে উকিঝুঁকি দেয়। আন্দ্রিয়েভ ছিলেন নীটশের প্রভাবে আবরিত, এমন কি তাঁর অতিরীন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণ তাও নীটশের নিকটেই প্রাপ্য। তেমনি ছিলেন ক্রিয়াবাইন। রুশীয়দের আকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছুর শেষ, পরম—তা শুধু নীটশের কাছেই তাঁরা পেতেন। সঙ্গীতে বা সাহিত্যকর্মে বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার পূর্বে, নিজে হ'য়ে উঠবার পূর্বে তাদের সামনে থাকা উচিত বিপুল সুযোগ।"

পাস্তেরনাক বললেন, সম্প্রতি তিনি পূর্বজর্মান দেশের একটি পত্রিকা, কোলোন থেকে প্রকাশিত, তাতে "মানুষ কী" বিষয়ের ওপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। "আমার যৌবনের দিনগুলোয় নীটশে ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিন্তানায়ক অথচ আজ তাঁকে কী ভয়ানক পুরাতনপন্থী ব'লে মনে হয়! কী বিপুল প্রভাবই না পড়েছিল—ভাগনারের উপর, গোর্কির উপর··· গোর্কি তো তাঁর ধ্যানধারণায় ভরপুর ছিলেন। আসলে নীটশের প্রধানতম কর্মই ছিল তাঁর সময়ের সব মন্দ রুচি ছড়িয়ে দেওয়া। তখন প্রায় অখ্যাত, কীয়ের্কেগার্দ, তিনিই আসলে চিহ্নিত হয়েছিলেন আমাদের সময়ের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তারের জন্য। বারদেয়েভ-এর রচনা আমি আরো ভালো করে বুঝতে চাই, মনে হয় তিনি আমাদের যুগের ভাবনারই অংশীদার—আমাদের সময়ের একজন প্রতিভূ রচয়িতা।"

ভোজন কক্ষ ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে এলো। আমরা উঠে এলাম সেই তলেই একটা ছোটো আলোজ্বলা বসবার ঘরে। পাস্তেরনাক খাবার পাতে শেষ পদ হিসেবে ভানজারিন লেবু এনে দিলেন। আগেই এর আস্বাদন করেছি—এই-

রকম অনুভূতি নিয়ে ওগুলো খেতে শুরু লাগলাম। তানজারিন পাস্টেরনাকের রচনায় বহু ব্যবহৃত—ড. জিভাগোর শুরুতে, তার প্রথম দিকের কবিতায়। আনুষ্ঠানিক তৃষ্ণা নিবারণ হিসেবে এই ফলের প্রতীকিত হওয়া। তারপর রয়েছে পাস্তেরনাকের কবিতার স্মৃতি জাগরুক অন্য উপাদান, যেমন বাইরে প্রবহমান তুষারঝঞ্ঝা—খোলা বৃহৎ পিয়ানো, কৃষ্ণকায় ও বিপুল, যেন কক্ষের অধিকাংশ অধিকার করে আছে।

······তথাপি আমরা খুব কাছাকাছি
প্রদোষ আলোকে, সঙ্গীত মূর্ছনা ভরে
অগ্নিকুণ্ড, বছর বছর ডায়েরির পাতার মতন। (মূর্ছিত পিয়ানো)

ভোজনকক্ষের মতোই এ ঘরের দেয়ালেও লিওনিভ পাস্তেরনাকের অঙ্কিত চিত্রাবলী ঝুলছে। ঘরের আবহাওয়া যুগপৎ গম্ভীর ও হাল্কা।

মনে হলো যে প্রশ্নটা আমার কাছে খুবই জরুরি সেই বিষয়ে পাস্তেরনাককে জিগগেস করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। ড. জিভাগো রচনাকালে যাঁরা ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁদের কাছে শুনেছি পাস্তেরনাক তাঁর অধিকাংশ প্রাক্তন কবিতা সাময়িক ও যুগচিহ্নিত বলে বাতিল করেছিলেন। এ রটনা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছে হয় না। তাঁর 'থীমস এণ্ড ভ্যারিয়েশন্স' ও 'মাই সিসটার লাইফ' যদিও বিশের দশকের পক্ষে পরীক্ষামূলক তথাপি তাতে ছিলো রূপদী পরিপূর্ণতা। রুশীয় লেখক ও কবিদের আমি দেখেছি এঁর কবিতাগুলো স্মৃতিমগ্ন রেখে মাঝে মাঝে আবেগে আবৃত্তি করতে। সমকালীন তরুণ কবিদের রচনার অন্তরে প্রায়শ পাস্তেরনাকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত, মায়াকোভস্কি ও পাস্তেরনাক দুজনে নিজস্ব চিহ্নে উনিশশো বিশের বছরগুলো ও বিপ্লবের দিনগুলোর প্রকৃষ্ট প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তখন শিল্প ও বিপ্লবী ভাবনাসমূহ পরস্পর সম্পৃক্ত ছিলো। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও ভাবনামালার অচ্ছেদ তরঙ্গ সহজেই কাউকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। তখন অন্যকোনো বিষয় ছিল যা কাউকে আপ্লুত করতে পারে (তরুণ রুশীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমি সেই সব বিগত দিনের প্রতি এক সহন-প্রবণতা লক্ষ্য করেছি।) তবে কি পাস্তেরনাক তাঁর প্রথম জীবনের রচনাবলী বাতিল করেছেন ব'লে গুজবটি সত্য হ'তে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে পাস্তেরনাকের মধ্যে একটা ক্ষীণ বিরক্তি আমি স্পষ্টতই লক্ষ্য করলাম। হ'তে পারে তিনি কেবলমাত্র সেইসব যৌবনের কবিতার জন্যই মূলত প্রশংসিত হ'তে ইচ্ছে করেন না। হয়তো বা অনুভব করেন সে-সব রচনার টান আজো বড়ো দুর্লঙ্ঘ্য। অথবা কারণ যে সাধারণত শিল্পকর্তা তাঁর অতীত কর্ম নিয়ে অখুশী থাকতে অভ্যস্ত এবং পক্ষান্তরে সমসাময়িক শিল্পভাবনাগুলোই তাঁর নিকট উপযুক্ত সমস্যামাত্র ?

"এই সব কবিতা কেবল দ্রুতগঠিত রেখাচিত্রণ—কেবল আমাদের পূর্বসূরীদের রচনার সঙ্গে এর তুলনা ক'রে দেখ.........দস্তয়েভস্কি ও তলস্তয় তো শুধুমাত্র উপন্যাসকার নন, ব্লকও শুধুমাত্র কবি নন। সম্পূর্ণ সাহিত্যের অবয়বে—জগতের গতানুগতিকতা, প্রচল প্রথাসমূহ, প্রতিষ্ঠিত নামের মধ্যে—এঁদের তিনটি কণ্ঠস্বর বাঙ্‌ময় হয়েছিল কারণ তাঁদের কিছু বলার ছিল......এবং তা বজ্রবাণীর মতো কথিত হয়েছিল। বিশ দশকের সুযোগ সুবিধা যদি বল, তবে আমার পিতাকেই উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যাক। কতো না অনুসন্ধান, কতো না পরিশ্রম তিনি করতেন একেকটা চিত্র গ'ড়ে তুলতে! বিশ দশকে আমাদের সফলতা আংশিকভাবে দৈবের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমার সমসামিকগণ ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে সহজেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেকের শিল্পকর্মই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল সাময়িকতার শাসনে। ফলে বিশ্বজনীনতার অভাব ছিল তাতে। এখন তাঁরা প্রবীণ হয়েছেন। তাছাড়া, আমার ধারণা আজ আর আমাদের অভিজ্ঞতার বিপুলতা ও বৈচিত্র্য গীতিকবিতার অবয়বে প্রকাশ সম্ভব নয়। জীবন অত্যন্ত দুর্বহ ও জটিল হ'য়ে উঠেছে। এমন সব মূল্যবোধ আমরা অর্জন করেছি যা যথার্থ প্রকাশিত হয় গদ্যে। আমি তা আমার উপন্যাসে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, মনে মনে স্থির করেছি আমার নাটকের বেলায়।"

জিভাগোর বিষয়টা কী ? ১৯৫৭তে আপনি যেমন নিশ্চয় করে বলেছিলেন জিভাগোই আপনার উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র—তা কি এখনো আপনি বিশ্বাস করেন ?

"আমি যখন ড. জিভাগো রচনা করি তখন সমকালীনদের প্রতি আমার অসীম এক ঋণবোধ ছিল। তখন আসলে এই উপন্যাসের দ্বারাই আমি ঋণ

শোধ করতে চেয়েছিলাম। উপন্যাস রচনার ধীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঋণবোধও আমাকে ক্রমশ গ্রাস করছিল। দীর্ঘদিনের কেবল গীতিকবিতা অথবা অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত থেকে, মনে হয়েছিল আমাদের যুগ সম্পর্কে—সেই সব বছরগুলো, দূরে পিছিয়ে গিয়েও যা এখনো আমাদের মনের উপর সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে—তার বিষয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ করা আমার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সময় চলে যাচ্ছিল। আমি খুব চেয়েছিলাম অতীতকে নথীভুক্ত করতে এবং সেই দিনের রুশীয় সুন্দর ও সংবেদনশীল অনুভবগুলো ড. জিভাগোয় সম্মানিত করতে। সে দিনগুলো আর ফিরবে না। অথবা ফিরবে না আমাদের পিতা-পিতামহদের কাল ; কিন্তু ভবিষ্যতের বিরাট পুষ্পিত দিনে, আমি প্রত্যক্ষ করতে পারছি, তাদের মূল্যবোধ পুনরায় পরিচর্চিত হবে। আমি তাই বর্ণনা করতে চেয়েছি। জানি না ড. জিভাগো উপন্যাস হিসেবে কতটুকু সার্থক। কিন্তু এর সব ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ, মনে হয়, আমার প্রাক্তন কাব্যপ্রচেষ্টার তুলনায় অধিক মূল্যবান। আমার যৌবনের রচনা তুলনায় এইটি অনেক গভীরতর মানবিকতা সম্পদে সমৃদ্ধ।”

বিশ দশকে আপনার সমসাময়িকদের মধ্যে আপনার মতে দীর্ঘস্থায়িত্ব কার হবে ?

“তুমি জানো মায়াকোভ্স্কি আমার কাছে কতখানি। আমার আত্মজীবনী ‘সেফ কনডাক্ট’-এ আমি এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তাঁর শেষদিকের অধিকাংশ কবিতাই আমার মনে বিশেষ আলোড়ন আনে না অবশ্য তাঁর শেষ অসমাপ্ত কবিতা ‘আমার কণ্ঠস্বরের শেষ পর্দায়’—ব্যতিক্রম। নির্মাণ শৈলির বিচ্যুতি, ভাবনার দৈন্যতা, অসমান্তরলতা যা সেই যুগের কবিতার লক্ষণ আমার কাছে তা সবই অনাস্বাদিত। ব্যতিক্রমও ছিলো। আমি এসেনীনের পুরোটাই ভালোবাসি, তিনি রুশীয় মাটির গন্ধ তাঁর কাব্যে ধৃত রেখেছিলেন। আমার কাছে স্ভেতাইয়েভার স্থান অতি উচ্চে—তিনি তো কাব্যজীবনের সুরু থেকেই এক পরিণত কবি। এক কৃত্রিমতার যুগে তিনি ছিলেন স্ব কণ্ঠস্বরের অধিকারীণী—মানবিক, ধ্রুপদী। এই রমণীটি ছিলেন পুরুষের আত্মার অধিকারী। প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম ছিল তাঁর শক্তির উৎস। অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন প্রকৃষ্ট সেই বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। আখমাতোভার

চেয়ে তিনি অনেক বড়ো কবি, তাঁর সারল্য ও কাব্যিকতা আমি চিরকালই প্রশংসাবাক্যে ভূষিত করেছি। তৎসত্ত্বেও তাইয়েভার মৃত্যু আমার জীবনে এক অসীম দুঃখময় ঘটনা।"

আন্দ্রেই বেইলি—যিনি সেকালে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন, তাঁর বিষয়ে আপনার মতামত কী?

"বেইলি ছিলেন অত্যন্ত রুদ্ধ প্রকৃতির, অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাঁর যা করণীয় ছিল তা কখনো সভাগীতির থেকে মহৎ হয়ে উঠতে পারে নি। যদি তিনি সত্যিই নানা যন্ত্রণা সহ্য করে থাকতেন তবে সম্ভবত কোনো মহৎ রচনা তাঁর দ্বারা সম্ভব হতো যাতে তাঁর ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তিনি কখনোই সত্যিকারের জীবনের মুখোমুখি আসেন নি। সেই নব্যশৈলির প্রতি আকর্ষিত যারা তাদের ভাগ্যই তরুণ বয়সে মৃত বেইলির অনুরূপ। আমি কখনো সেই নব্য ভাষার, সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভূ অভিব্যক্তির শৈলির স্বপ্নের অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই নি। এই স্বপ্নের জন্যই বিশদশকের অধিকাংশ রচনা যা চাতুর্যময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল—টিঁকতে সক্ষম হল না। সবচেয়ে অভূতপূর্ব আবিষ্কার তখনি হল যখন যা বলতে হবে তা নিয়ে শিল্পরচয়িতা বিমূঢ় হয়েছেন। অবশেষে তিনি আশু প্রয়োজনে সেই পুরানো ভাষাই ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন এবং ভেতর থেকে রূপান্তরিত হলো সে পুরানো ভাষা। এমন কি সে সময়েও অনেকে দুঃখ পেয়েছেন এই ভেবে যে বেইলি বাস্তব জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তা না হ'লে হয়তো তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠতো।"

সমকালীন তরুণ কবিদের বিষয়ে আপনার মতামত কী?

"রুশদের প্রাত্যহিক জীবনে যে কবিতা একটা অংশ হয়ে উঠেছে এটা আমাকে অত্যন্ত চমৎকৃত করে। একজন পশ্চিমদেশীয়ের কাছেও কোনো তরুণ কবির কবিতার গ্রন্থের কুড়ি হাজার ছাপানো সংস্করণ অভূতপূর্ব মনে হবে। অবশ্য রাশিয়ায় কবিতা যতখানি প্রাণবেগসম্পন্ন বলে তোমার মনে হবে—তা ঠিক নয়। বস্তুত কবিতা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর নিকটই এখন আদরনীয়। আর আজকের কবিতা প্রায়ই খুবই সাধারণ। দেয়াল ঢাকার কাগজের নকশা, যথেষ্ট মনোহর অথচ তা সত্যিকারের অস্তিত্বের প্রয়োজনহীনতায় ভুগছে। অবশ্য কয়েকজন তরুণ প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছেন—যেমন এভতুশেঙ্কো।"

বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে রুশীয় সাহিত্যে কাব্যই গদ্যের তুলনায় অধিক উৎকর্ষতা লাভ করেছিল তা কি আপনার মনে হয় না?

"এখন আর আমি একথাটা মনে করি না। আমার বিশ্বাস গদ্যই হচ্ছে আজকের ভাব প্রকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম। যে গদ্য বিস্তৃত, গভীরতর যেমন ফকনার লিখেছেন। আজকের সাহিত্যকর্ম অবশ্যই জীবনের সবগুলো স্তরকে পুরোপুরি নবরূপ দেবার দায় নেবে। আমি আমার নতুন নাটকে এটাই করার চেষ্টা করছি। 'চেষ্টা করছি' কারণ এখন প্রাত্যহিক জীবন আমার পক্ষে অত্যন্ত জটিল হ'য়ে উঠেছে। সব জায়গায়ই নিশ্চিত প্রত্যেক প্রখ্যাত লেখকের জীবন এমনি জটিল হ'য়ে উঠেছে, অবশ্য আমি কেবল এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। গূঢ়তা ও শান্তশ্রীহীন জীবন আমার কাছে কাম্য বলে আমি মনে করি না। মনে হয় একদা যৌবনে অনেক করণীয় কর্ম ছিল, যা জীবনেরই অংশ বিশেষ, যা জীবনের অন্য সব কিছুকে আলোকিত করে তুলতো। এখন ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে তার জন্য আমাকে সংগ্রাম করতে হয়। পণ্ডিতদের, সম্পাদকগণের, পাঠকদের সেই সব দাবী আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না, অথচ অনুবাদ ও অন্যান্য কাজ আমার সময়কে গ্রাস করে নিয়ত…। বহির্বিশ্বে যারা আমার বিষয়ে উৎসাহী তুমি অবশ্য তাদের জানাবে আমার অন্যতম জরুরি সমস্যা হচ্ছে—নিদারুণ সময়াভাব।"

পাস্তেরনাকের কাছে আমার শেষ যাওয়া বেশ দীর্ঘসময়ব্যাপী ছিল। তিনি আমাকে একটু তাড়াতাড়িই আসতে বলেছিলেন সেদিন, যাতে আমরা সেদিনের আলাপন বিশেষ আহারের পূর্বেই সমাপ্ত করতে পারি। সেদিন তাঁদের একটা পারিবারিক ভোজের দিন ছিল। পাস্তেরনাক প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে ফেরার আগেই আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি যখন পড়ার ঘরটায় প্রবেশ করেছি তখন সমস্ত গৃহ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল হাস্যচ্ছোল কণ্ঠস্বরে। বাড়ির পেছন দিকটায় কোথাও পরিবারের সকলে জড়ো হয়েছেন।

পাস্তেরনাকের পাঠকক্ষটি দ্বিতলে একটি বৃহৎ আসবাবশূন্য ঘর। গৃহের অন্যান্য অংশের মতোই এ ঘরেও খুবই কম আসবাব ছিল। কেবল জানালার ধারে একটা বড় ডেস্ক, কয়েকটা চেয়ার, একটা আরামকেদারা। জানালা দিয়ে বাইরের আলো এসে ঢুকছে কক্ষটিতে আর বাইরে দেখা যাচ্ছে মস্ত বরফে

আচ্ছাদিত উজ্জ্বল মাঠ। আলোর মুখোমুখি ধূসর কাঠের দেয়াল জুড়ে অগণিত শিল্পচিত্র-পোষ্টকার্ড। ঘরে প্রবেশ করে পাস্তেরনাক বললেন, ঐ সব পোষ্টকার্ড তাঁকে তাঁর পাঠকদের পাঠানো—অধিকাংশই বহির্বিশ্ব থেকে। বেশির ভাগই ধর্মীয় দৃশ্যাবলীর ছবিতে ভরা—মধ্যযুগীয় যীশুর জন্ম বা তৎসম্বন্ধীয়। সন্ত জর্জের ড্রাগন হত্যা, সন্ত মাগদালেন··· ··। এগুলো সবই ড. জিভাগোর বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রাতঃভ্রমণের শেষে পাস্তেরনাককে বিশেষ সুস্থ দেখাচ্ছিল। পরিধান করেছিলেন কলেজের ছাত্রদের মতো নীল খেলোয়াড় কোট আর মেজাজটা ছিল বিশেষ ভালো। জানালার সামনে ডেস্কটায় তিনি বসলেন এবং আমাকে তাঁর কোণাকুণি বসতে বললেন। অন্যান্য দিনের মতোই ঘরের আবহাওয়াটা ছিল বেশ ঢিলেঢালা অথচ তীব্রভাবে মনস্ক। মনে আছে অত্যন্ত উৎফুল্লবোধ করছিলাম—পাস্তেরনাক নিজেও বেশ আনন্দময় ছিলেন মনে হচ্ছিল—জানালা দিয়ে উত্তপ্ত সূর্য ঘরে আসছিল । দু-তিন ঘণ্টা যা ওখানে বসে বসে আমরা কাটিয়েছি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যদি এই সময়টা দীর্ঘতর করা যেত—কালই মস্কো ত্যাগ করে ফিরে যাচ্ছি—কিন্তু যে প্রবল উজ্জ্বল সূর্যালোক কক্ষটিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল তাও দিবসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মলিনতর হ'য়ে এল।

পাস্তেরনাক তাঁর নবতম নাটকটি বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। মুহূর্তের এক বিশেষ ক্ষণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। মোহিতাবস্থায় আমি তাঁর কথা শুনতে লাগলাম—আমার দিক থেকে কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল। একবার কী দুবারমাত্র কোনো ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যমূলক গূঢ়ার্থ আমি ওঁর নিকট জানতে চেয়েছিলাম।

"আমার বিশ্বাস তোমার ব্যক্তিগত পশ্চাৎপটের জন্যই—যা উনিশ শতকের রুশীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে অনেকখানি জড়িত—তোমার পক্ষে আমার নতুন নাটকের কাঠামোটা জেনে উৎসাহিত হবার কারণ আছে। আমি বস্তুত একটি ত্রিস্তর রচনায় মগ্ন আছি। এই রচনাটির এক তৃতীয়াংশ প্রায় লিখে ফেলেছি।

"আমি সেই ঐতিহাসিক সমস্ত যুগটাকে নতুন ক'রে রচনা করতে চাই—তা হচ্ছে উনিশশতকের রাশিয়া আর আর প্রধান ঘটনা অর্থাৎ কৃষি-দাসদের মুক্তি। অবশ্য আমাদের ওই সময়টা কেন্দ্র করে অনেকরকম রচনাদি রয়েছে—

যদিও ঘটনাগুলোর কোনো আধুনিক ভাবনার বিশ্লেষণ নেই। বিশাল এক পটভূমিকে নিয়ে—যেমন গোগোলের ডেড সোলস্—লিখতে চাই। ডেড সোলস্-এর মতোই যেন আমার নাটকও বাস্তবানুগ ও প্রাত্যহিক জীবনের সামিল হ'তে পারে। যদিও নাটকগুলো বেশ দীর্ঘায়তনই হবে তবু মনে হয় এক সান্ধ্য আসরেই তা অভিনীত হ'তে পারবে। প্রায় অধিকাংশ নাটকই তো শুনি অভিনয়ের প্রয়োজনে কাটছাট করতে হয়। ইংরেজদের আমি সাধুবাদ দিই, কারণ তারা জানে শেকস্পীয়রকে কী উপায়ে ছাটতে হয়। যা কিছু আবশ্যিক তাই শুধু তারা রাখে অথচ যা যথার্থ উল্লেখ্য তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বও স্থাপন করতে পারে। সম্প্রতি কোমেদি-ফ্রাঁসেজ মস্কোতে এসেছিল। ওরা কিন্তু রাসীনকে কাটছাট করে না—অবশ্য আমি মনে করি এটা অতি গভীর ভুল। আজকের দিনে যা কিছু বাঙ্ময় শুধুমাত্র তাই নাটক হিসেবে মঞ্চে অভিনীত হওয়া বিধেয়।

"আমার ত্রিস্তর নাটকে কৃষি-দাসপ্রথা উচ্ছেদের দীর্ঘ সময় ব্যাপী কার্যকারণের মধ্য থেকে তিনটি অর্থপূর্ণ অধ্যায় বেছে নিয়েছি। প্রথম নাট্যঘটনা ঘটছে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে—এই সময়ই সারা দেশ জুড়ে কৃষি-দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক যুগ প্রায় সমাপ্তির পথে অথচ রাশিয়ার জন্য তখনো কোনো শরীরী ভাবনা দেখা যায় নি। দ্বিতীয় খণ্ডের সময় আঠারশোর ষাটের দশক। উদারনীতির জমিদারদের ইতিহাসে আগমন হয়েছে এবং রুশীয় অভিজাতদের মধ্যে অগ্রগণ্যদের সকলেই পশ্চিমের ভাবনাচিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠছে। প্রথম দু' খণ্ডের যেমন বৃহৎ গ্রামীণ জমিদারীই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত তেমনি তৃতীয় খণ্ডের হচ্ছে আঠারো শতকের আশির দশকের সেণ্ট পীটার্সবার্গ। অবশ্য এই অংশটুকু এখন পর্যন্ত ভাবনার স্তরেই রয়েছে। অন্য দুই খণ্ডের কিছু কিছু অংশ এর মধ্যে লেখাও হয়েছে। যদি তুমি ইচ্ছে কর তবে ঐ দুই খণ্ড বিষয়ে আমি আরো বর্ণনামূলক ভাবে তোমাকে বলতে পারি।

"প্রথম নাটক জীবনকে অপরিমার্জিত রূপে, অকিঞ্চিৎকর হিসেবে, অর্থাৎ যেমন ডেড সোলস্-এর প্রথম খণ্ডে আছে, তেমনি দেখানো হয়েছে। কোনোরূপ আত্মিকশক্তি স্পর্শ করার পূর্বে জীবন যেমন ছিল এখনেও তেমনি আছে।

"ভেবে নাও ১৮৪০ নাগাদ একটা মস্ত জমিদারী গ্রাম রাশিয়ায় হারিয়ে গেল। কারণটা মূলত অশেষ অবহেলা, ফলে অর্থগত ভাবে হ'য়ে গেল দেউলিয়া। জমিদারীর যারা প্রধান অর্থাৎ কাউন্ট ও তার গৃহিণী, তারা, ওখানে অবর্তমান। তাঁরা দেশ ভ্রমণে গেছেন কারণ তাদের চাষী প্রজাদের মধ্যে যারা বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে নাম দেবে তাদের লটারির মাধ্যমে তকমা বিলির মতো বেদনাময় কাজটা প্রত্যক্ষ করতে অনিচ্ছুক। তুমি তো জানো তখনকার দিনে সৈন্যদলের চাকুরী রাশিয়ায় পঁচিশ বছরের জন্য স্থায়ী হ'ত। কাউন্ট ও কাউন্ট-পত্নীর ফেরবার সময় হয়েছে আর তাই গৃহস্থালীর সবাই তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রথম দৃশ্যে দেখছি চাকরদাসীরা বাড়ি পরিষ্কার করছে—ঝাটপাট, ধুলো ঝাড়া, পরিষ্কার পর্দা টানানো। বেশ খানিকটা গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—দাসীমেয়েদের মধ্যে হাস্যরোল, ঠাট্টা ছুঁড়ে দেওয়া নেওয়া চলছে।

"আসলে রাশিয়ার গ্রামজীবনের এই অংশে সময় বেশ অসুবিধাজনক তখন। দ্রুত কাজের লোকজনদের মেজাজ গম্ভীর হয়ে পড়ল। ওদের কথাবার্তা থেকেই স্পষ্ট যে পাশের অরণ্যে কিছু ডাকাত গাঢাকা দিয়ে আছে—তারা সম্ভবত পলাতক সৈনিকদল। আমরা আরো নানা গালগল্প শুনতে পেলাম যেমন, ক্যাথেরিন দি গ্রেটের আমল থেকে ওখানেই ঘোরাফেরা করছে গৃহে জোর ক'রে প্রবেশ ক'রে যারা হত্যা করে তেমন দল। এই মহিলা তো বিকৃত যৌনরুচীর মানুষ ছিল, একজন সত্যিকারের ঐতিহাসিক চরিত্র যার কৃষিদাসদের অত্যাচার ও ভয় দেখিয়ে আনন্দ লাভ হ'তো।

"দাসদাসীরা তাকের ওপর রাখা একটা প্লাস্টারের ঊর্ধাঙ্গ মূর্তির সম্পর্কেও আলোচনা করেছিল। এটা আসলে আঠারো শতকীয় কেশ পারিপাট্যের একটি রূপবান যুবকের শিরস্ত্র। বলা হয় এই ঊর্ধাঙ্গ মূর্তিটির একটা দৈব অর্থও আছে। এর ভাগ্য বস্তুত জমিদারীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে এটার ধুলো ঝাড়তে হবে যাতে হঠাৎ না ভেঙে যায়।

"নাটকের প্রধান চরিত্র জমিদারীর ব্যবস্থাপক প্রোকোর। সে কাঠ ও গম বিক্রির উদ্দেশ্যে শহরে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়েছে—কারণ জমিদারী এইসব বিক্রিপাট্যার উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু শহরে যাওয়ার বদলে সে কাজের

লোকদের সঙ্গে হৈহৈ-তে মত্ত হয়। তার হঠাৎ মনে হয় কিছু পুরোনো নৃত্যের মুখোশপোষাক গৃহে আছে। তারই একটা পরে সে তার সহকারী কুসংস্কারাচ্ছন্নদের ভয় দেখাবে ব'লে মনস্থির করল। পোষাক পড়ল যেন শয়তান—চোখ দুটো মাছের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। যেমনি না ওই কিম্ভূত পোষাকে সে এলো তখনি ঘোষণা করা হল যে জমিদারীর মালিক এসে পৌছেছেন। তাড়াতাড়িতে দাসদাসীর দল গিয়ে জড়ো হল প্রবেশদ্বারের কাছে প্রভু ও প্রভুপত্নীকে স্বাগত জানাতে। প্রোকোর আর কোনো দিশে না পেয়ে লুকালো গিয়ে একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠে।

"কাউণ্ট ও কাউণ্টপত্নীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করতে পারলাম তাদের দুজনের মধ্যে এক গভীর উত্তেজনা বিরাজিত। এটাও জানা গেল যে প্রত্যাবর্তনের পথে কাউণ্টমশাই তার পত্নীর অলঙ্কারগুলো হাত করতে চেয়েছিল। বন্ধকরাখা জমিদারী ভিন্ন তাদের সম্পদ বলতে ওগুলোই শুধু অবশিষ্ট ছিল। কাউণ্টপত্নী প্রত্যাখ্যান করে এবং কাউণ্ট তাকে অত্যাচারের ভয় দেখালে ভ্রমণের সঙ্গী একজন তরুণ সাজভৃত্য এক অবিশ্বাস্য বিরোধিতায় কাউণ্টপত্নীকে রক্ষা করল। তাকে অবশ্য এখনও কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নি। কিন্তু এটা তো কেবল কিছুটা সময়ের ব্যাপারমাত্র—কাউণ্ট সময়মত তার ক্রোধের চাবুক সাজভৃত্যটির উপর প্রয়োগ করবে।

"কাউণ্ট যখন আবার পত্নীর উপর ভীতিপ্রদর্শন আরম্ভ করল তখন সেই তরুণটি—যার আর বিশেষ কিছু বেশি হারাবার আশঙ্কা নেই তখুনি আনিত একটা পিস্তল ঝট করে তুলে নিল হাতে। গুলি নিক্ষেপ করল কাউণ্টকে লক্ষ্য ক'রে। চারপাশে প্রবল বিশৃঙ্খলা—দাসদাসীরা ছোটাছুটি করছে, চিৎকার করছে। প্লাস্টার মূর্তিটি উল্টিয়ে পড়ে সহস্র টুকরো হ'য়ে গেল। এর পতনের ফলে একটি দাসী-মেয়ে আঘাত পেল এবং অন্ধ হয়ে গেল। এই মেয়েটিই হচ্ছে ট্রিনজির নামের "অন্ধ সুন্দরী"। নামটা আসলে রাশিয়ার প্রতীক। যার সৌন্দর্য এবং ভাগ্য এতকাল সকলে ভুলে ছিল। যদিও "অন্ধ সুন্দরী"-ও একজন কৃষিদাসকন্যা কিন্তু সে একজন শিল্পী। নিজে জমিদারীর যে দাসদের সমবেত গীতদল আছে তারই একজন অন্যতম সদস্য—অত্যন্ত উঁচুদরের গায়িকা।

"আহত কাউণ্টকে ঘর থেকে নিয়ে যাবার সময়, কাউণ্টেস সকলের অলক্ষ্যে

তার গহনাগুলো তরুণ সাজভৃত্যের হাতে তুলে দেয়। সাজভৃত্য নিঃশব্দে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় আত্মরক্ষার জন্য। বেচারা প্রোকোর, যে তখনো তার বিদ্ঘুটে পোষাকে গোপন স্থানে পালিয়ে ছিল, তাকেই শেষ পর্যন্ত গহনা অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত হতে হল। যেহেতু কাউন্টপত্নী সত্য ঘটনা প্রকাশ করলো না, ফলে প্রোকোরকে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে সাইবেরিয়ায় চালান করা হল।……

"বুঝতে পারছো, এ সবই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর নাটকীয়তায় পূর্ণ। অবশ্য বিশ্বাস করি, থিয়েটর অবশ্যই আবেগমুখর, ঘটনাবহুল হওয়াই বাঞ্ছনীয়…… মনে হয় মঞ্চে কিছু না ঘটার জন্য সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে……থিয়েটার হচ্ছে আবেগ প্রকাশের শিল্পমাধ্যম—এটা অবশ্য বাস্তবকে প্রকাশেরও মাধ্যম। পুনরায় রোমাঞ্চকর আবেগপূর্ণ নাটকের প্রশংসাতেই আমাদের মুখর হওয়া উচিত : ভিকতর য়ুগো, শীলের……

"আমি এখন দ্বিতীয় নাটকের কাজে ব্যস্ত। এখন পর্যন্ত, এই অংশ নানা দৃশ্যে বিভক্ত। সেই জমিদারী, অবশ্য সময়টা পালটিয়েছে। এখন ১৮৬০, অর্থাৎ কৃষিদাসদের মুক্তির সমসাময়িক। জমিদারী এখন সেই কাউন্টের এক ভাগিনেয়র। এতোদিনে হয়ত বা এই নতুন জমিদার তার কৃষিদাসদের মুক্তি দিত, কিন্তু দেয় নি কারণ অন্যান্য সকলে এতে অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে ভেবে। সে ছিল সংস্কারমুক্ত ও শিল্পপ্রেমী। আর তার ভালোবাসার শিল্প-শাখা হচ্ছে নাটক-অভিনয়। একটি অসাধারণ নাট্যসংস্থার কর্ণধার ছিল সে। যদিও, এই সংস্থার অভিনেতারা সকলেই কৃষিদাস—কিন্তু তাদের অভিনয়ের সুখ্যাতি তখন সমস্ত রাশিয়ায় ছড়িয়ে গেছে।

"প্রথম নাটকের যে মেয়েটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারই পুত্র এই নাটকেদলের প্রধান অভিনেতা। ট্রিলজির এই অংশেরও নায়ক সে। তার নাম আগাফন, অত্যন্ত প্রতিভাশালী অভিনেতা সে। কাউন্ট তাকে অত্যন্ত উঁচুদরের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

"নাটক শুরু হচ্ছে তুষার ঝড়ে……" পাস্তেরনাক এই বর্ণনা দিলেন তাঁর দীর্ঘ দুহাত বিস্তার করে করে। "একজন স্বনামধন্য অতিথির জমিদারীতে আগমনের কথা—তিনি তখন রাশিয়ার ভ্রমণরত আলেকজান্দার দ্যুমা। একটা

নতুন নাটকের উদ্বোধনের দিনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নাটকের নাম "আত্মহত্যা"। আমি হয়ত বা এটাও লিখবো—একটা নাটকের ভেতরে আর একটি নাটক, যেমন হ্যামলেটে আছে। উনিশশতকের মধ্যভাগের রুচি অনুযায়ী একটা রোমাঞ্চকর আবেগপূর্ণ নাটক লিখতে আমার ভালোই লাগবে।......

"আলেকজান্দার ডুমা ও তাঁর দলবল তুষার ঝড়ের প্রকোপে জমিদারীর কাছেই একটা বাহনবদলের আড্ডাখানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ওখানে একটা দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। এবং এই আড্ডাখানার অধিকারী আমাদের প্রোকোর ভিন্ন অন্য কেই বা হতে পারে? কয়েক বছর হ'ল সে সাইবেরিয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে—কারণ কাউন্টেস তার মৃত্যুশয্যায় প্রোকোরের নিরপরাধ স্বীকার করে গেছে। সে এই বাহনবদলের আড্ডাখানাটা চালিয়ে ক্রমাগত বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করছে। যদিও একটা নবযুগের পদক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যমান, তবু এই সরাইখানার আবহাওয়াটা যেন নাটকের প্রথমাংশের মধ্যযুগীয় অবস্থারই প্রতিধ্বনি বহন করছে। আমরা দেখছি স্থানীয় জহ্লাদ ও তার সহকারী এই সরাইখানাতেই এসে উঠলো। শহর থেকে গভীর বনের ভিতর তাদের গৃহে তারা প্রত্যাবর্তন করছে—কারণ সামাজিক রীতি অনুযায়ী ঘাতকদের লোকালয়ের কাছাকাছি বসবাস নিষিদ্ধ।

"যখন অতিথিরা সবাই এসে পৌছান তখন একটা বিশেষ মূল্যবান দৃশ্য জমিদারিতে অভিনীত হয়। আলেকজান্দার ডুমা ও আগাফনের মধ্যে এক দীর্ঘ শিল্প বিষয়ক আলোচনা চলে। এই অংশ আমার নিজের শিল্প ভাবনার উপর আলোকপাত করবে—তা অবশ্যই আঠারোশো ষাটের দশকের মতানুগ হবে না। আগাফন বিদেশে যাবার স্বপ্নে মশগুল, হ'তে চায় শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনেতা, অভিনয় করতে চায় হ্যামলেটে।

নাটকের এই অংশেরও প্রায় প্রথমাংশের অনুরূপ পরিণতি লক্ষণীয়। সরাইখানায় যাকে প্রথম দেখেছি সেই কুশ্রী চরিত্রের মানুষটি হচ্ছে স্থানীয় পুলিশ প্রধান। এ মানুষটি হচ্ছে একরকম ডেড সোলস-এর চরিত্র সোবাকেভিচ্-এর অনুরূপ—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যত রকমের কুশ্রীতা আছে এ তারই মূর্তিমান। 'আত্মহত্যা' নাটকের অভিনয়ের শেষে সে সাজঘরে একটি তরুণী অভিনেত্রীকে

ধর্ষণ করবার চেষ্টা করে। মেয়েটিকে রক্ষা করতে আগাফন একটা শাম্পেনের বোতল দিয়ে পুলিশ প্রধানকে আঘাত করে শাস্তির ভয়ে পালাতে বাধ্য হয়। অবশ্য কাউণ্ট তাকে সাহায্য করেন এবং তাকে পারীতে পালাতে সহায়তাও করেন।

"তৃতীয় খণ্ডে, আগাফন রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে এবং সেন্ট পীটার্সবার্গে বসবাস সুরু করে। সে তো এখন আর কৃষিদাস নয় (এটা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ), ফলে সে হ'য়ে ওঠে একজন বিখ্যাত ও সার্থক অভিনেতা। শেষ পর্যন্ত সে তার মায়ের অন্ধত্ব সারিয়ে তোলে একজন খ্যাতমান য়ুরোপীয় চক্ষু চিকিৎসকের সাহায্যে।

"প্রোকোর নাটকের শেষ খণ্ডে একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী। আমি তাকে মধ্যবিত্ত সমাজের একজন প্রতিভূ হিসেবে দেখাতে চাই—যে মধ্যবিত্ত সমাজ উনিশ শতকের শেষাংশে রাশিয়ার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। যেমন, ভেবে নাও একজন স্কুকাইন যে শতাব্দীর শেষ ও শুরুতে মস্কোয় সেইসব সুন্দর চিত্রাবলী সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিল। বস্তুত, ট্রিলজির শেষে আমি দেখাতে চাই যে—এক নতুন বিত্তবান, শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে যারা পশ্চিমী অনুপ্রেরণায় প্রতিভাসিত, প্রগতিবাদী, মেধাবী, শিল্পপ্রেমী......"

আমাকে তাঁর নাটকের বিষয় অত্যন্ত বাস্তবিক ভাবে, যে পালাগানের বর্ণনা পাঠ করছেন,—বলা পাস্তেরনাকের পক্ষেই চরিত্রানুগ। ট্রিলজির পশ্চাৎপটের ভাবনাটা কিন্তু তিনি আমাকে সত্যি ব্যক্ত করতে চান নি, যদিও খানিকটা পরেই এটা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে তিনি বস্তুত বিষয় হিসেবে শিল্প ভাবনাকে গ্রাহ্য করেছেন—ঐতিহাসিক পটভূমিকা হিসেবে নয়, এখানে শিল্প যা চলমান জীবনের উপাদানের একটি অঙ্গ। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম তিনি যা বলছেন তা আসলে তাঁর নতুন কাজের কাঠামোটা। এই কাঠামোর কিছু কিছু অংশ সমাপ্ত হয়েছে, আর সব এখনো পূর্ণ করতে হবে।

"প্রথমে, আমি উনবিংশ শতাব্দীর সব রকম দলিলদস্তাবেজ পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমার অনুসন্ধানের কাজটা শেষ হয়েছে। আসলে, রচনাটির ঐতিহাসিক বিশুদ্ধতা তেমন কিছু জরুরি ব্যাপার নয়। জরুরি হচ্ছে একটা যুগকে সার্থকভাবে সৃষ্টি করাটাই। যে ব্যাপারটা বর্ণনা করছি তা তেমন

কিছু একটা জরুরি নয়, জরুরি হচ্ছে সেই আলো যা ওই ব্যাপারটার উপর পড়ছে, যেমন বেশ দূরের একটা ঘরে আলো এসে পড়ে···"

ট্রিলজির বর্ণনার শেষ দিকে পাস্তেরনাক স্বাভাবিকভাবেই একটু তাড়াহুড়ো করছিলেন। ভোজনের সময় অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যেই হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। যদিও তিনি নাটকগুলোর অসাধারণ কাঠামোর দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার সময় পান নি, তবু আমার মনে হয় আমি রাশিয়ার অতীত-এর উল্লেখ্য আবাহনের একজন স্বাক্ষী হয়ে রইলাম।

"আমাদের পিতাপিতামহদের কাহিনী যে স্টুয়ার্ট যুগের দিনগুলো
পুশকিন থেকে আরো দূরে যা কেবল দৃশ্যমান হয় স্বপ্নে"

আমরা যখন ভোজন কক্ষে নেমে এলাম পরিবারের সকলেই তখন বৃহৎ খাবার টেবিলের চারপাশে আসন গ্রহণ করেছেন। "এদের দেখতে একটি ইম্প্রেশনিস্ট ছবির মতন মনে হচ্ছে না?" পাস্তেরনাক বললেন। "পশ্চাৎপটে জিরেইনিয়াম বৃক্ষ আর এই পড়ন্ত বিকেলের আলো। সাইমনের আঁকা ঠিক এইরূপ একটা চিত্র আছে···"

আমরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়ালেন এবং যতক্ষণ পাস্তেরনাক আমাকে টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পরিচিত করাচ্ছেন ততক্ষণ সকলে দাঁড়িয়েই রইলেন। শ্রীমতী পাস্তেরনাক ছাড়া, পাস্তেরনাকের দুই পুত্র ছিলেন—প্রথমজন তাঁর প্রথম বিবাহের ফলে—আর কনিষ্ঠ পুত্র, যার বয়স হবে আঠারো অথবা কুড়ি—সুদর্শন, বাদামী, দেখতে ঠিক তার মায়ের অনুরূপ। সে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়ে। অধ্যাপক নিহায়ুসও ছিলেন একজন অতিথি। তিনি মস্কো সঙ্গীত সংগ্রহশালার বিখ্যাত শোপ্যা শিক্ষক, যাঁর সঙ্গে এক সময় মাদাম পাস্তেরনাকের পরিণয় হয়েছিল। তিনি কিন্তু বেশ বয়স্ক, পুরানোকালের রীতি অনুযায়ী গোঁফ জোড়া, অত্যন্ত সুদর্শন ও পরিশীলিত। তিনি পারী বিষয়ে জিগ্‌গেসাবাদ করলেন, জানতে চাইলেন সেখানকার সঙ্গীতপ্রেমীদের কথা যাদের আমরা উভয়েই চিনি। সেখানে আরো দুজন মহিলা টেবিলে ছিলো তাঁদের সঙ্গে পাস্তেরনাক পরিবারের আসল সম্পর্ক আমি বুঝতে পারি নি।

আমি পাস্তেরনাকের ডান পাশে ও মাদাম বাঁপাশে বসলেন। টেবল বেশ

সাধারণ ভাবে সাজানো, সাদা রুশীয় লিনেন ঢাকনি পাতা যাতে লাল সুতোর কারুকাজ। কাটাচামচ ও বাসনপত্র বেশ সাধারণ। মধ্যখানে একটা পাত্রে লজ্জাবতী লতা, পাত্রপূর্ণ কমলালেবু ও ভানজারিন নানা প্রকার চাটনি টেবলে রক্ষিত। অতিথিরা সে সব প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে দিতে লাগল যখন পাস্তেরনাক ভোদকা ঢালছিলেন। ছিল কেভিয়ের, হেরিং মাছের উপাদন, আচারের তেলে ভেজান খাদ্যদ্রব্য, শবজি······বেশ ধীরেই আহার পর্ব চলছিল। স্কোয়াশ দেওয়া হল—এই পানীয়টি গৃহে প্রস্তুত এক ধরনের জারিত তরল পদার্থ যা সাধারণত গ্রামের মানুষরাই পান করে। যেহেতু জাড়িত করা হয় ফলে মাঝে মাঝে রাতে স্কোয়াশের বোতলের মুখ থেকে ছিপি ছিটকে যায় পিস্তলের গুলির মতো সবাইকে জাগিয়ে দেয়। বললেন মাদাম পাস্তেরনাক। চাটনিগুলো প্রত্যেকের চাখা হয়ে গেলে পাচক আনলো সরস পাখির মাংসের স্টু।

আলাপন অত্যন্ত সাধারণ সুরেই চলছিল। হেমিংওয়ের লেখা নিয়ে আলোচনা হয়। গত শীতে মস্কোতে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত লেখক। তাঁর রচনার একটা নতুন সংকলন সবেমাত্র প্রকাশিত হল। মাদাম পাস্তেরনাক এবং অন্যান্য মহিলারা জানালেন যে তাদের হেমিংওয়েকে একঘেয়ে মনে হয়েছে—সেই সব অশেষ মদ্যপান অথচ নায়কদের নিয়ে প্রায় কিছু ঘটছে না।

পাস্তেরনাক যিনি এতক্ষণ নির্বাক ছিলেন হঠাৎ অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

"একজন রচয়িতার মহত্ব কখনোই রচনার বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। কেবল দেখতে হবে বিষয় রচয়িতাকে কতটুকু ছুঁয়ে যায়। রচয়িতার স্টাইলের গভীরতাই একমাত্র গ্রাহ্য। হেমিংওয়ের স্টাইলের মধ্য দিয়ে তুমি স্পর্শ পাও বস্তুর, লোহার, কাঠের······" তিনি যেন তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করছিলেন তাঁর দুই হাত দিয়ে, টেবিলের কাঠের উপর হাত চেপে চেপে। "আমি হেমিংওয়ের প্রশংসা করি কিন্তু আমি ফকনারের যতটুকু জানি তাতে তাঁকেই অধিক পছন্দ করি। 'অগাস্টের আলো' একটা অসাধারণ গ্রন্থ। সেই যে ছোট্ট পোয়াতী বৌটি, তার চরিত্র তো ভুলবার নয়। যখন সে আলাবামা থেকে টেনেসি পর্যন্ত পদব্রজে চলে, যা মার্কিন দেশের অসীম দক্ষিণের প্রতিভূ, তার

সারাৎসার, এখানে সহজেই বিধৃত হয়েছে আমাদের মতো পাঠকের জন্য যারা কখনো সেখানে যায় নি।"

পরে আলোচনা আরম্ভ হল সঙ্গীত নিয়ে। অধ্যাপক নিহায়ুস ও পাস্তেরনাক শোপ্যাঁর ব্যাখ্যা বিষয়ে নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হলেন। পাস্তেরনাক বললেন তিনি শোপ্যাঁ কতখানি ভালোবাসেন—"অবশ্য আমি যা বলছিলাম তার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়—শোপ্যাঁ যেমন একেবারে নতুন একটা বক্তব্যের জন্য ব্যবহার করেছেন সেই প্রাচীন মোৎসার্টীয় ভাষা—আঙ্গিকটা যেন ভেতর থেকে নবজন্ম লাভ করল। অবশ্য আমি জানি যুক্তরাষ্ট্রে এখন কিছুটা প্রাচীনপন্থী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। আমি শোপ্যাঁ বিষয়ে একটা রচনা স্টিফেন স্পেণ্ডরকে দিয়েছিলাম যা তিনি প্রকাশ করেন নি।

আমি বললাম জিদ শোপ্যাঁ বাজাতে কী ভালোবাসতেন—পাস্তেরনাক এটা জানতেন না, ফলে শুনে চমৎকৃত হলেন। আলোচনা মোড় নিল প্রুস্ত-এর দিকে। এই সময় পাস্তেরনাক বেশ ধীরে প্রুস্ত পড়ছিলেন।

"এখন আমি 'A La Recherche du Temps Perdu' গ্রন্থের শেষাশেষি এসে গেছি। আমার ভাবতে বিস্ময় হয় আমরা ১৯১০-এ যে সব ভাবনা নিয়ে তন্ময় ছিলাম এই গ্রন্থে তার অনেককিছুর প্রতিধ্বনি কি প্রবল সোচ্চার। আমি এই বিষয়টা একটা বক্তৃতায় নিবদ্ধ করেছিলাম, 'প্রতীকীবাদ ও অবিনশ্বরতা' নামে, যা লিও তলস্তয়-এর প্রয়াণের আগের দিন পাঠ করেছিলাম। আস্তাপোভাতে গিয়েছিলাম পরদিন আমার বাবার সঙ্গে। এই রচনাটি দীর্ঘদিন হল হারিয়ে গেছে। প্রতীকীবাদ-এর চরিত্র বিষয়ে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এটাও বলেছিলাম যে, যদিও শিল্পীরও প্রয়াণ ঘটে অথচ জীবিত থাকার যে আনন্দ যা তিনি অভিজ্ঞতায় সঞ্চার করেছেন তা কিন্তু অবিনশ্বর। যদি এই অভিজ্ঞতা কোনো উপায়ে ব্যক্তিগত অথচ সার্বজনীন একটা আকৃতিতে পরিবেশন করা যায় তবে যথার্থই তা অন্যের নিকট পুনর্জীবন লাভ করতে পারে তাঁর রচনার মধ্য দিয়েই।......

"আমি সর্বদাই ফরাসী সাহিত্য পছন্দ করেছি," পাস্তেরনাক বলছিলেন। "যুদ্ধের সময় থেকে, আমার মনে হয়, ফরাসী সাহিত্য একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতি অর্জন করেছে যা প্রায় অনালঙ্কারিক। কাম্যুর মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকের

কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি!" (পূর্বেই আমি কাম্যুর মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ পাস্তেরনাককে দিয়েছিলাম, আমার মস্কো যাবার কিছু পূর্বেই এ ঘটনা ঘটে। রুশীয় কাগজে খবরটা প্রকাশিত হয়নি। রাশিয়ান ভাষায় কাম্যুর অনুবাদও কখনো হয়নি)) "বিষয়গত প্রভেদ থাকলেও ফরাশী সাহিত্য আসলে আমাদের খুব কাছের। কিন্তু ফরাশী লেখকরা যখন কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হন তখন তাঁরা বিশেষভাবে আকর্ষণের অযোগ্য হ'য়ে ওঠেন। হয় তখন তাঁরা চক্রী ও কপট অথবা তাঁদের ফরাশী যুক্তি দ্বারা ঠিক করেন যে তাঁদের এই মহার্ঘ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বহন করতে হবে। তাঁরা ভাবেন যে অবশ্যই তাঁরা প্রত্যেকে এক একজন স্বয়ম্ভূসাধক যেমন ছিলেন রোব্‌স্‌পীয়ের অথবা সঁ্যাৎ-যুস্ত-এ মতো।"

ভোজনপর্বের শেষে চা ও কোনিয়াক পরিবেশন করা হল। পাস্তেরনাক হঠাৎ কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। যেমন সর্বদাই হয়েছে আমার রাশিয়ায় বাসকালীন আমাকে পশ্চিমদেশ বিষয়ে নানা-প্রকার প্রশ্ন করা হক—পশ্চিমের সংস্কৃতির জীবন ও আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব।

আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ছয়টা অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে। এবার আমাকে ফিরতে হবে। আমিও খুব পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম।

পাকশালার মধ্য দিয়ে পাস্তেরনাক আমাকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। নীলাভ তুষারের সন্ধ্যায় আমরা বাইরের ছোট্ট বারান্দায় পরস্পরকে বিদায় জানালাম। রেরেডেলকিনোতে আর ফিরবো না এই ভাবনাই আমাকে বিমর্ষ করে তুললো। পাস্তেরনাক আমার হাত নিজের হাতে রাখলেন কিছুক্ষণ, আমাকে পুনরায় তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি আমাকে আবারও অনুরোধ করলেন তাঁর বিদেশের বান্ধবদের জানাতে যে তিনি ভালো আছেন। যদিও তিনি তাঁদের সকলের পত্রের উত্তর দিতে পারেন না সময়াভাবে তবু তিনি তাঁদের প্রত্যেককে মনে রেখেছেন। যখন আমি বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে গেছি তখন তিনি আমাকে ফিরে ডাকলেন। আমিও খুশি হলাম আর একবার থামবার অজুহাত পেয়ে, ফিরে এলাম, আর একবার খালি মাথায়

পাস্তেরনাককে দেখবো বলে, তাঁর পরিধানে নীল ব্লেজার দরোজার আলোর নীচে।

"দয়া করে,", তিনি বললেন, "আমি চিঠি পাওয়া বিষয়ে যা বলেছি তা নিজের উপর নিও না। আমাকে অবশ্যই চিঠি লিখবে, যে কোনো ভাষায় তোমার পছন্দমতো। আমি তোমাকে উত্তর দেব।"

বেদগানের রীতিপ্রকৃতি

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বেদের মন্ত্রভাগকে বলা হয় সংহিতা, কারণ মন্ত্রগুলি একত্রে সংহিতরূপে অবস্থান করছে এই বিভাগে। ঋক্‌সংহিতা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা অধিক ও প্রধানতম মন্ত্রসংগ্রহ। এক একটি মন্ত্রই ছিল এক একটি ঋক্। এই বিরাট মন্ত্র সংগ্রহ আসলে ছিল দ্বিপদী কাব্যবন্ধের সঞ্চয়ন, যেগুলিতে দেবজাতীয় বহু নেতা সংস্তুত হয়েছেন। তা ছাড়া, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে উপলক্ষ্য করেও কম ঋক্ রচিত হয়নি। আদিতে এইগুলি রচিত হয়েছিল তৎকালীন কথ্য-ভাষায় এবং সেইভাবেই সেগুলি গাওয়া হত। কারা এগুলি রচনা করেছিলেন, তা জানা যায় না এবং কারা সর্বপ্রথম এগুলিতে সুর দিয়েছিলেন তাও জানবার উপায় নেই। মন্ত্রগুলি রচনা করেছিলেন বহু ব্যক্তি যাঁদের দেবজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এদের ভাষা ছিল বিভিন্ন, তবে সবগুলির মধ্যেই একটা সংযোগসূত্র ছিল। এই সব জাতির কোনটিই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই; বহুযুগ আগেই তাঁদের বিলুপ্তি ঘটেছে। ক্রমে এই বৃহৎ সংগ্রহ একটি বিরাট স্তূপ হয়ে দাঁড়ালো। বিষয় হিসাবে এর কোনও বিন্যাসের পরিকল্পনা ছিল না। একমাত্র সাহিত্য হওয়াতে দেবগোষ্ঠি ও তৎসন্নিহিত অপরাপর সমাজের লোকেরা বিপদে, আপদে, উৎসবে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে,—এই ঋক্‌সমূহের আবৃত্তি করে বা গেয়ে আনন্দ পেতেন, মনোবল সঞ্চয় করতেন এবং উৎসাহিত হতেন। ধীরে ধীরে সেই সব সমাজের অবক্ষয় ঘটতে লাগল এবং পরবর্তী-কালে যাঁরা এই সাহিত্যের ধারক বিবেচিত হলেন, তাঁরা এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে লাগলেন। এর ফলে, সুপ্রাচীন তাবৎ সভ্য সমাজের ভাষাগুলির সংস্কার সাধন করে একটি নতুন ভাষার সৃষ্টি হল, যার নাম দেওয়া হল সংস্কৃতভাষা। এ ভাষা কৃত্রিম। এতে কেউ কথা বলতেন না; কিন্তু সকল সমাজে সাধুভাষা বলে এই সংস্কৃত ভাষা পরিগৃহীত হল। এই ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। একদা এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই দেবভূমি সংলগ্ন পিতৃলোকের অধিবাসী ছিলেন। সামাজিক ও

আনুষ্ঠানিক কার্যাদিতে নিযুক্ত থাক্তেন বলে এঁদের শ্রদ্ধাবশতঃ পিতৃসম্বোধন করা হত। এঁরাই সেই সুবৃহৎ প্রাকৃত সাহিত্যকে শতশত বৎসর ধরে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করে এসেছিলেন। তারপর একটা যুগ এল যখন সুপ্রাচীন চলিত ভাষায় রচিত ঋক্ সমূহ সর্বতোভাবে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হল। বলা বাহুল্য, বহু আদিম ঋক্ বিলুপ্ত হয়েছে; যা ছিল, তার বহুলাংশেও পরিবর্তন ঘটেছে এবং বিস্তৃতভাবে নব যোজনায় অবকাশও ঘটেছে। এই নবপ্রবর্তিত সাহিত্যেরই নাম দেওয়া হল "বেদ।"

সুপ্রাচীন কালে পূজাপদ্ধতির আড়ম্বর ও আধিক্য তেমন ছিল না, কারণ তাঁদের অবস্থান ভূমি পর্যাপ্ত হলেও বহুবিস্তৃত ছিল না এবং ইহজগৎকে অতিক্রম করে অধ্যাত্মচিন্তা তাঁদের মধ্যে আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁরা যাঁদের স্তুতি করতেন, যা প্রকাশ করতেন, তা সবই প্রত্যক্ষদর্শন বা অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। তার অতিরিক্ত চিন্তা তাঁদের মনে প্রশ্নের অবতারণা করেনি। কিন্তু, ক্রমে যে জাতিরা বৈদিক সাহিত্যকে অধিকার করলেন তাঁদের পূজাপদ্ধতি বিরাট আকার ধারণ করল। এই সব পূজাঘটিত ব্যাপারে তাঁরা এই মন্ত্রগুলিকেই প্রয়োগ করলেন। অনুষ্ঠানাদিতে প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব মন্ত্রাদির পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা হল। এতদ্ব্যতীত নানা ঘটনার সূত্র ধরেও মন্ত্র বিন্যাসের অবকাশ ঘটেছে। এইভাবে, বারম্বার সংস্কৃত বেদসংহিতার নবভাবে বিভাজন হতে হতে এই বেদসমূহ আজকের আকৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

কিন্তু, যুগ যুগ ধরে এত পরিবর্তনের ফলেও সামান্য সংখ্যক মন্ত্র বহুল পরিমাণে তাদের আদিম প্রাকৃত ধারাকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যাগযজ্ঞাদিতে যেসব মন্ত্র উদ্গাতারা গাইতেন, সেইগুলি সেই সুপ্রাচীন ভাষা এবং সুরেই গেয়ে আসা হচ্ছিল। সংস্কৃত ভাষার সমর্থকবৃন্দ এদের উপর কতকটা হস্তক্ষেপ করলেও সম্পূর্ণভাবে করেননি। তাঁরা আবহমানকাল ধরে প্রচলিত মন্ত্রগানের রীতিনীতিকেই রক্ষা করে এসেছিলেন। উদ্গাতাদের যখন কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনও বিশেষ মন্ত্র গাইতে বলা হত তখন তাঁরা সেই মন্ত্রটি প্রাক্‌সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন রীতিতেই গাইতেন। এযুগে যেমন বিবাহাদি কার্যে আমরা নিজ নিজ ভাষা ব্যবহার না করে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ মন্ত্রকেই অবলম্বন করি ঐতিহ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে, তৎকালে যজ্ঞাদিকার্যেও সেই

মনোভাব কার্যকর হয়েছিল। তবে, সুপ্রাচীন কথ্যভাষায় সম্পূর্ণ উদাহরণ আমরা পাই না, লোকপরম্পরা তার কিছুটা সংস্কৃতভাষার আয়ত্তে এসে পড়েছে। তথাপি, বহু শব্দের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে, যা আমাদের কাছে সেই আদিম-কালের ভাষার নিদর্শন তুলে ধরে। এই রীতির যেসব গান উদ্গাতারা গাইতেন, তা "গ্রামগেয় গান" রূপে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

এই প্রাকৃতভাষায় রচিত গানগুলি যখন সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে, তখন যে জাতিরা এগুলি অভ্যাস করতেন, তাঁদের মধ্যে এই চিন্তা সঞ্চারিত হল যে, এই সুরগুলির সংরক্ষণের একটা উপায় নির্ণয় করা আবশ্যক। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা প্রতিটি অক্ষরের উপর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,—এইভাবে সংখ্যা আরোপ করে একটি সরল স্বরলিপির উদ্ভাবন করলেন। এই প্রত্যেকটি সংখ্যা এক একটি স্বরকে নির্দেশ করত। তাঁরা জানতেন যে এমন একটা দিন আসবে, যখন এই সব মন্ত্রের সুর হয় থাকবে না, নয়তো অতিমাত্রায় বিকৃত হয়ে যাবে। তাই তাঁরা গায়ন সমাজে এই সব গানের সঙ্কেত ও রীতিনীতি যাতে সংরক্ষিত থাকে, তার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে, বহুশত বৎসর এসব গান নির্দিষ্ট ধারায় বিশুদ্ধভাবে গেয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু, ক্রমে সেই সব গোষ্ঠীরও বিলোপ ঘটতে লাগল এবং গানগুলিতেও প্রবলভাবে বিকৃতি দেখা দিল। তথাপি সেই অবস্থাতেই এই সব গ্রামগেয় গান যাগযজ্ঞাদিতে প্রযুক্ত হয়ে আসতে লাগল।

এমনটা যে শুধু গানের ক্ষেত্রে ঘটেছিল তাই নয়, সংস্কৃত ভাষাও কালক্রমে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হতে লাগল এবং তার প্রয়োগেও নানা অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। এরই ফলে, ব্যাকরণ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। ভাষার রক্ষাকল্পে ব্যাকরণ এবং বৈদিক সঙ্গীতের শুদ্ধতা সংরক্ষণের প্রয়াসে "শিক্ষা" নামক একটি বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটল স্বাভাবিক প্রেরণার ফলেই। এই বিভাগগুলিকেই আমরা বেদাঙ্গ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। শিক্ষা এবং ব্যাকরণ,—একে অপরের পরিপূরক; কেননা উভয় ধারাতেই ভাষা এবং উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করবার আবশ্যকতা দেখা গিয়েছিল। এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, সেটি হচ্ছে মন্ত্র আবৃত্তির একটি পদ্ধতি স্থাপন। নারদী শিক্ষা

এই পর্যায়ের শাস্ত্র। নারদ নিজে গ্রন্থকে "নিরুক্ত" বলেও নির্দেশ করেছেন (১।২।৩) কেননা অনেক তত্ত্বের ব্যুৎপত্তিগত বিবরণও তাঁকে দিতে হয়েছে।

বহুতর শিক্ষাগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র নারদীশিক্ষাতেই বৈদিক সঙ্গীত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়েছে। গ্রামগেয় সঙ্গীতের উল্লেখে সংখ্যা দ্বারা স্বরের নির্দেশ সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি। প্রকৃতপক্ষে, এইটিই ছিল সামস্বর বলতে যা বোঝায় তাই। কিন্তু, মন্ত্রগুলির ভাষা যখন সংস্কৃতে রূপান্তরিত হল, তখন সেগুলি পঠনরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। এই পঠনের মধ্যে কিন্তু স্বরের একটা ধারা পাওয়া যেত। গোড়ার দিকে বোধ করি উচ্চ এবং নীচ, এই দুই স্বরে, বর্ণবিন্যাসের লঘু, গুরু রীতিকে মেনে পাঠ করা হত। সংস্কৃত ভাষার ধর্মই এই যে তা লঘুগুরুবর্ণের সুষ্ঠু সন্নিবেশে পাঠও হয়। এই উচ্চারণ রীতি না মানলে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্বকে রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না। অতএব এই দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হল এবং ছন্দের এই নিয়মকে মেনে চলতে গিয়ে ভাষার যে একটা হিল্লোল পাওয়া গেল, তা ধ্বনির ওঠা পড়ায় একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করল। ক্রমে, স্বরের দিক থেকে, এই উচ্চতাকে বলা হল "উদাত্ত" এবং নিম্নতার সংজ্ঞা দেওয়া হল "অনুদাত্ত"। কিন্তু, কিছুকাল এই পদ্ধতি অনুসরণের পরে দেখা গেল আর একটি ধ্বনিও পঠন পাঠনকে শাসন করছে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই তিনটি বিশিষ্ট ধ্বনিই সংস্কৃত বেদমন্ত্রের হিল্লোলিত গতিকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এই স্বরটিই স্বরিতরূপে পরিচিত হয়েছে। এইভাবে, সংস্কৃত ঋক্ মন্ত্রের পাঠ,—এই তিনটি, অর্থাৎ, উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত স্বরত্রয়েই প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু, এতেও আবৃত্তির চাহিদা সম্পূর্ণ মেটেনি। কালক্রমে, স্বরের ইতর-বিশেষ এবং অলঙ্করণ ঘটেছে। এইরকম প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন স্বরূপ স্বরিতের কয়েকটি রূপ,—প্রচয়, নিঘাত এবং কম্পস্বর নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। স্বরিত পর্যায়ে স্বরক্ষেপণের বৈচিত্র্যের জন্যই শিক্ষাকারগণ স্বরগুলির আলোচনায় স্বরিত স্বরটিকে নিয়েই বিশেষ চিন্তা করেছিলেন এবং স্বরিতের বিভিন্ন অবস্থিতি অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার ভেদের উল্লেখ করা হয়েছে।

তার পূর্বে, কিন্তু, বলা প্রয়োজন যে শিক্ষাকারগণ উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত,—এই তিনটি স্বর যথার্থভাবে প্রচলিত লৌকিক স্বরগ্রামের কোন কোন

স্থানে অবস্থান করছে, সেটি নির্ণয় করতে বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন; কেননা এই আবৃত্তি এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যে তাতে এই তিনটি উচ্চারণস্থানের বিচ্যুতি অতিশয় পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। এই ধরণের বিকৃতপাঠ থেকে কোন্ স্বরটি কোথায় অবস্থান করছে তা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিচ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত,—এই তিনটি সংজ্ঞা পূর্ব থেকেই আবৃত্তির মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। উদাত্ত স্বর আমাদের স্বরগ্রামের কোন্ পর্দায় দাঁড়াচ্ছে সেটা না ধরা গেলে আপেক্ষিকভাবে অন্যান্য স্বরের স্থান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, উদ্গাতা ব্রাহ্মণগণ কালক্রমে স্বরগত বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। পুরুষানুক্রমে চলে আসা ঐতিহ্যের অনুসরণে তাঁরা মন্ত্রাদি পাঠ করতেন বটে, কিন্তু সেগুলি বিকৃত পাঠে পর্যবসিত হত। আসলে বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়েই এটি ঘটেছিল এবং এদিকে মনোযোগও তেমন দেওয়া হত না।

স্বরনিরূপণের রীতি পদ্ধতি দেখে অনুমান হয়, শিক্ষাকারগণ এই উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কিভাবে এটা করা হয়েছিল তার কোনও উল্লেখ নেই; তবে সম্ভবতঃ যাঁরা সামগানে পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের কণ্ঠে মন্ত্রগান শুনে এই সংখ্যাগুলি কোন্ কোন্ লৌকিক স্বরে অবস্থান করতে পারে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা হয়েছিল। এইভাবে, এক আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টার পর তাঁরা সামস্বর এবং লৌকিকস্বরাদির মধ্যে একটি সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন। নারদী শিক্ষায় এর সূত্রটি ধরে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। এই শিক্ষায় সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায় যে সামগান মধ্যম স্বর থেকে আরম্ভ হত এবং ক্রমনিম্নগতিতে ষড়্জ স্বরে এসে পৌঁছোতো। ষড়্জস্বরের পূর্ববর্তী স্বরকে মন্দ্রস্বর বলা হত। এটি খাদের ধৈবতের সঙ্গে তুলনীয় ছিল এবং তার পরে প্রয়োজন হলে মন্দ্রধৈবত থেকে ষড়্জের নিম্নস্থ নিষাদ পর্যন্ত সুরকে ঈষৎ চড়ানো হত। এই নিষাদকে "অতিস্বার" বলা হয়েছে। অর্থাৎ, অবরোহক্রমে আচরিত মন্ত্রগানের স্বরগুলির অবস্থিতি ছিল এইরকম :

১ (মধ্যম), ২ (গান্ধার), ৩ (ঋষভ), ৪ (ষড়্জ), ৫ (মন্দ্রধৈবত, অথবা মন্দ্র), ৬ (মন্দ্রনিষাদ বা অতিস্বার) এবং ৭ (মন্দ্র পঞ্চম)। এ সম্পর্কে

একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে, নারদীশিক্ষা অনুসারে যে স্বরগ্রাম নির্ণয় করা হয়, সেটি আমাদের বর্তমান স্বরগ্রামের অনুরূপ। কয়েকজন গবেষক মধ্যযুগীয় গ্রন্থাদির অনুসরণে কাফিঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলে স্বীকার করলেও এটি কতখানি যুক্তিসঙ্গত সেটি সন্দেহের বিষয়। শিক্ষাকার নারদও বাইশটি শ্রুতির ভিত্তিতেই বৈদিক স্বরগ্রামের সূত্র নির্ণয় করেছিলেন। যাই হোক, সামস্বরের প্রসঙ্গেই আসি। কার্যতঃ, সামগানে পাঁচটি স্বর বর্ণাদির উপর লিখিত হত; কিন্তু অতিস্বারে কোনও বর্ণ উচ্চারিত হত না, কেবলমাত্র প্রয়োজনে মন্দ্রস্বরকে কর্ষণ করে নিষাদ পর্যন্ত চড়ানো হত। এই "স্বার" শব্দটি নিয়েও বেশ কিছু আলোচনা এই গ্রন্থে হয়েছে। যে ধ্বনি বিশেষ কোনও পর্দায় পড়ে না অথচ দুটি স্বরের মধ্যবর্তী কোনও বিশেষ শ্রুতিতে অবস্থান করে, তাকেই 'স্বার' বলা হয়। শিক্ষাকার নারদ এই আখ্যাগুলি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, যা থেকে এইগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক পরিমাণে নির্ধারণ করা যায়। বিশেষ করে, তিনি যখন সংহিতা পাঠের রীতিনীতি বিশ্লেষণ করেছেন তখন এই সব স্বরের উচ্চারণপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকখানি স্পষ্ট হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত—এই দুটি সংজ্ঞার কোনটিই কোনও নির্দিষ্ট স্বরস্থানের সূচনা প্রদান করে না; কেবল আনুমানিক, চড়া বা নিম্ন পর্যায়ের স্বরকে নির্দেশ করে। অপরপক্ষে, "স্বরিত" শব্দটিতে কোনও একটি ধ্বনি, যা স্বরে পরিণত হয়েছে—এইটুকুই মাত্র বোঝায়; অর্থাৎ স্বরিত কথাটির সহজ ব্যাখ্যা,—"স্বরে উপস্থাপিত"। তাই, এই সংজ্ঞাটি কিঞ্চিৎ সমস্যা সঙ্কুল এবং এর উচ্চারণগত বিভিন্নতার সুযোগ নিয়ে এর কয়েকটি প্রকারভেদ পরিকল্পিত হয়েছে।

পূর্বালোচনায় দুইরকম রীতির উল্লেখ করা হয়েছে;—একটি গানের রীতিতে সম্পাদিত হত গ্রামগেয় সামকে কেন্দ্র করে, অপরটি অনুষ্ঠিত হত সুরেলা আবৃত্তির প্রথায়,—যেটি প্রযুক্ত হত সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত ঋক্ বা সামসংহিতায়। সামগানের স্বরাত্মক নির্দেশিত হয়েছে সংখ্যা অনুসারে; কিভাবে করা হয়েছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া হল:

৪ ২র র ১ ১
ওগ্নাই। আয়াহী ৩ বীই তোয়া ২ ই। তোয়া ২ ই।

১র ২র ১ ১ ১ ২র
গৃণানোহ। ব্যদাতোয়া ২ ই। তোয়া ২ ই। নাই হোতা সা ২৩।
১ ৩ ৫র র ৩ ৫
ৎ সা ২ য়ি। বা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। হী ২ ৩ ৪ ষি॥

(গ্রামগেয় সাম)

এরই সংস্কৃতে রূপান্তরিত বিন্যাসে সাম এবং ঋগ্বেদ সংহিতায় এইরকম দেখা যায় :

২ ৩ ১ ২ ৩১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অ গ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
১ ২র ৩ ১ ২
নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥

(সামবেদ সংহিতা)

অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥

(ঋগ্বেদ সংহিতা)

এই উদাহরণটি থেকে দেখা যাবে, সংহিতাপাঠের কালে সামবেদ এবং ঋগ্বেদ,—দুটিই ত্রিস্বরে আবৃত্তি করা হত। অতএব গ্রামগেয় স্বরাঙ্কগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ঋক্‌পাঠ এবং সামপাঠের পদ্ধতি নির্ণয়ের আবশ্যকতা দেখা দিল। পণ্ডিতগণ বিচার করে দেখলেন যে ঋঙ্‌মন্ত্রের উদাত্ত স্বর যাঁরা প্রয়োগ করেন, তাঁরা সাধারণতঃ গান্ধার স্বরের অনুবর্তী হন এবং অনুদাত্তটি ঋষভ স্বরকে অধিকার করে। স্বরিত স্বরটিকে ষড়্‌জে স্থাপন করা হত। অতএব ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রগুলি,—গান্ধার, ঋষভ এবং ষড়্‌জ,—এই তিনটি স্বরেই সম্পাদিত হত; উদাত্তের কোনও চিহ্ন থাকত না। অনুদাত্তস্বর বর্ণের নিম্নে শায়িত রেখায় (—) চিহ্নিত হত এবং স্বরিতস্বরটি বর্ণের উর্দ্ধে এক সরল রেখায় (।) বোঝানো হত। এইভাবে পাঠ প্রচারিত হতে হতে দেখা গেল কোনও কোনও পাঠক

স্বরিতের ক্ষেত্রে কিছু ইতরবিশেষ ঘটাচ্ছেন, উদ্দেশ্য বোধ করি অলঙ্করণ। এ সম্বন্ধেও গ্রন্থে বহু আলোচনা আছে। স্বরিত স্বরটিকে একটু ওজস্বী কণ্ঠে উচ্চারিত করলে সেটি প্রচয় স্বরিতরূপে গণ্য হত। উক্ত স্বরটিকে আবার আঘাত দিয়ে উচ্চারণ করলে তার আখ্যা হত নিঘাত। কম্পস্বরেরও সংজ্ঞা এইরকম, অর্থাৎ স্বরিত যখন উদাত্ত বা অনুদাত্ত স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গমকের মত উচ্চারিত হত, তখন তাকেই বলা হত কম্পস্বর। এই গ্রন্থ থেকে যেটুকু অনুমান করা করা সম্ভব, তাতে মনে হয় "কম্প" অর্থে, উদাত্ত বা অনুদাত্ত স্বর থেকে মীড় বা গমকের মত ক্রিয়ায় স্বরিতে প্রত্যাবর্তন বোঝায়। এর বহু উদাহরণ ঋক্ সংহিতায় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সংহিতাকারে ঋক্‌পাঠের মত সংস্কৃতভাষায় সামবেদও তিনটি স্বরে পঠিত হত। এই সংহিতাপাঠ যাগযজ্ঞে নিয়োজিত ব্রাহ্মণ মাত্রেই সম্পাদন করতে পারবেন; কিন্তু গেয় অংশ কেবল মাত্র উদ্গাতা ছাড়া আর কেউ সম্পাদন করবার অধিকারী ছিলেন না। সামবেদ যখন সংহিতভাবে ত্রিস্বরে পাঠ করা হত তখন কিন্তু ঋক্‌পাঠের বিধিতে স্বরগুলি প্রযুক্ত হত না, লৌকিক স্বরগ্রামের সঙ্গে এর সমন্বয়ে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সাম সংখ্যার আলোচনায় বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ "১" সংখ্যক স্বরটি লৌকিক মধ্যম স্বরে স্থাপিত হত। অতএব, সামসংহিতায় যখন কোনও বর্ণের উপর ১ সংখ্যার আরোপ হত, তখন সেটি মধ্যমে সম্পাদিত হত। সাম পাঠের ক্ষেত্রে এটাই ছিল উদাত্ত স্বর। ঋক্ সংহিতায় যেখানে উদাত্তস্বর লৌকিক গান্ধারে স্থাপিত হয়েছে, সেখানে সাম-সংহিতার সর্বোচ্চস্বর হিসাবে এটিকে একপর্দা চড়িয়ে মধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে। সামের ক্ষেত্রে অনুদাত্ত স্বরটি ঋক্ পাঠের মত লৌকিক ঋষভেই স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু স্থান পরিবর্তিত হয়েছে স্বরিত স্বরের। সামপাঠের ক্ষেত্রে স্বরিত স্বরটি গান্ধার স্বরে স্থাপিত হয়েছে। ঋক্ পঠনের কালে এটি অবস্থিত ছিল ষড়্‌জ স্বরে। যাঁরা সামপাঠ করতেন, তাঁরা স্বরিত সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে স্বরিত স্বরটি উদাত্ত এবং অনুদাত্তের মধ্যবর্তী গান্ধারে স্থাপন করাই শ্রেয় এবং এতেই পাঠটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবার অবকাশ থাকে। সামের ক্ষেত্রে স্বরিতকে ষড়্‌জস্বরে স্থাপন করা আদৌ সম্ভব ছিলনা, কারণ সামের ত্রিস্বর

১, ২, ৩ অর্থাৎ মধ্যম, গান্ধার এবং ঋষভ,—এই তিনটি স্বরে পরিব্যাপ্ত ছিল। উচ্চস্বর হিসাবে "১" বা মধ্যম যথাযথ বলে পরিগণিত হত। নীচ বা অনুদাত্ত হিসাবে সর্বনিম্ন ঋষভস্বরে অবস্থিতিই সমুচিত বলে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু, স্বরিত স্বরটিকে এই দুই স্বরের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে মধ্যবর্তী গান্ধারে স্থাপন করাই বিধেয় বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এইভাবে ঋক্ এবং সাম—উভয় ক্ষেত্রেই তিনটি স্বরের প্রয়োগ হলেও উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সামের ক্ষেত্রে স্বরিতের প্রকার ভেদ নির্ণয় করা হয়নি এবং সামপাঠে "স্বার" নামক কোনও পর্যায়ের স্বরও ছিল না।

নারদী শিক্ষায় গ্রামগেয় গান সম্বন্ধে সামান্যই বলা হয়েছে এবং একমাত্র স্বরগুলি নির্ধারণ করা ছাড়া আর কোনও ব্যাপক আলোচনা এই শাস্ত্রে করা হয়নি। তবে, সামগানের প্রসঙ্গে তৎকালীন লৌকিক সঙ্গীতের কিছু কিছু প্রয়োগ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার যে আলোচনা করেছেন, তাতে সাধারণভাবে "মূর্ছনা" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তৎকালে গ্রামরাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা কিছুটা পরিজ্ঞাত হই।

এই শিক্ষায় গাত্রবীণার প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক। এক সময় ডান হাতের অঙ্গুলি-সমূহে স্বরসূচক রেখা অঙ্কিত করা হত এবং মন্ত্র আবৃত্তির সময় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা এই রেখাগুলি স্পর্শ করা হত। এটি ছিল ব্রাহ্মণ্যবিধি। আবৃত্তির রীতিনীতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মোটামুটি এই হল গ্রামগেয় সামগান এবং সংহিতা আবৃত্তির ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। গ্রামগেয় গানের ক্ষেত্রে একটি স্বরের কথা বলা হয়েছে, সেটির নাম "ক্রুষ্ট", ক্রুষ্ট অর্থে উচ্চস্বর বোঝায়। যে কোনও স্বরকে কিঞ্চিৎ চড়িয়ে দিলেও তাকে ক্রুষ্ট বলা যেতে পারে। আচার্য সায়ণ উদীয় আর্ষেয় ব্রাহ্মণে ক্রুষ্ট বলতে প্রথম বা মধ্যম স্বরকে ধরে নিয়েছেন। নারদীশিক্ষা এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। গ্রামগেয় সামগানের যে পাঠ আমরা পেয়ে এসেছি, সেটি অনুশীলন করলে এই ধারণাই হয় যে, আসলে গানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পাঁচটি স্বরেরই প্রয়োগ হত। মাঝে মাঝে ঈষৎ বিস্তার বা মীড়ের ধরণে নিষাদের ব্যবহার হত। সপ্তকের মধ্যে পঞ্চম স্বরটি গণনার মধ্যে থাকলেও অতিনিম্নত্ব হেতু গানে প্রযুক্ত হত না।

স্বর সম্বন্ধীয় আলোচনার পর অধিকাংশ আলোচনাই মূলতঃ উচ্চারণঘটিত। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভাষার নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছে; সন্ধি, সমাস, ইত্যাদির সংগঠন নির্ণয় করা হয়েছে; কিন্তু সংহিতাকারে যখন মন্ত্রগুলি পাঠ করা হত তখন নানাভাবে পদচ্ছেদ ঘটত, সন্ধিকে ভঙ্গ করতে হত এবং সমাসের নিয়মকে শিথিল করতে হত,—এমনকি যুক্তবর্ণের বিযুক্তিও ঘটত। আরও অনেক ব্যাপার ঘটত, যা ব্যাকরণের সমস্যা নয়, আবৃত্তির সমস্যা। এই বিষয়গুলিরও বহুবিধ নিয়মশৃঙ্খলা ছিল; যেগুলি পরে শিথিল হয়ে যায়। সেগুলিকে পুনরায় যতটা পারা যায় উদ্ধার করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিক্ষাকারগণ। উচ্চারণগত সমস্যার সঙ্গে রেফ, অনুস্বার, বিসর্গাদির প্রয়োগ কোন ক্ষেত্রে কিরকম হবে সে সম্বন্ধেও বেশ কিছু আলোচনা আছে বিশিষ্ট শিক্ষাগ্রন্থগুলিতে। ব্যাকরণই ভাষা সমস্যার শেষ সমাধান নয়; তার সঙ্গে শিক্ষা এবং ছন্দশাস্ত্র—এই দুটিতেও অবশ্যই অভিজ্ঞ হতে হবে নতুবা ভাষার সর্বাঙ্গীন তত্ত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি যথাযথ হবে না। নারদীশিক্ষা বিশেষভাবে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন,—"ছন্দোমান" অর্থাৎ ছন্দ দ্বারা নির্দিষ্ট মানটিকে বজায় রাখা। ছন্দ থাকলেও পঠনের যে একটা স্বাভাবিক লয় বা গতি আছে, তাকেও সমানভাবে রক্ষা করা কর্তব্য বলে গণ্য হত, নতুবা মন্ত্রপাঠে 'স্খলন' অবধারিত ছিল।

সঙ্গীতের দিক থেকে আর একটু আলোচনা না করলে এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হবে না। সামস্বরাদির যে লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তাতে মন্ত্রগান যে অবরোহধর্মী ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু, এও সত্য যে যখন এই রীতির মন্ত্রগান প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আরোহধর্মী লৌকিক গীতিও সমাজে সমানভাবে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থে বর্ণিত গ্রামরাগগুলি বা মূর্ছনাসমূহ আরোহধর্মী সঙ্গীতেরই দৃষ্টান্ত। যাঁরা অনুমান করেন সামগান থেকে আমাদের সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে, তাঁদের অনুমান কতখানি যুক্তিসিদ্ধ সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কোনও সঙ্গীতশাস্ত্রেই বৈদিক সঙ্গীত ও লৌকিক সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা এই মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করা হয়নি। এই বিশ্বাসের মূলে যে বস্তুটি আছে, সেটি সম্ভবতঃ এই যে, অতি প্রাচীন সাহিত্য বলতে বেদসংহিতাকেই বোঝাতো এবং এই মন্ত্রগুলিকে নিয়েই লৌকিক প্রথায় গানও আচরিত হত। এইভাবেই যে সঙ্গীত প্রবর্তিত হয়েছিল তা মন্ত্রগান নয়, তা

বেদকাব্যের গীতরূপ। এটা সকলেই করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ এযুগে যেমন বেদগান সম্পূর্ণ লৌকিক নিয়মে সম্পাদন করেছেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান বহু প্রাচীন যুগেও করা হত। ক্রমে যখন সংস্কৃতভাষা-সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে বিস্তৃত হয়ে গেল তখন সুপ্রাচীন লৌকিক রীতির বেদগান অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু আদিগান যে বেদমন্ত্র থেকে গৃহীত, সেই বিশ্বাস একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। আসলে যথার্থ মন্ত্রগান সম্পাদন করতেন উদ্গাতৃবৃন্দ, যাঁরা ঋষিসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁরা অবরোহধর্মী সামগানের আচরণই পালন করে এসেছিলেন।

যাঁরা এই অবরোহধর্মী বেদগান আচরণ করতেন এবং সংখ্যাদ্বারা স্বরলিপি নির্ণয় করে গেছেন, তাঁদের জাতি এবং সংস্কৃতিই ছিল আলাদা। তাঁরা সংস্কৃত-ভাষায় কথা বলতেন না, তাঁদের আচার-আচরণ অনেকটাই অন্যপ্রকার ছিল। বহুযুগ পূর্বেই সেই সব জাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। অতএব, তাঁদের সম্বন্ধে এখন কোনও অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু, এই অতি সাধারণস্তরের গ্রামগেয় গান বা সেগুলিতে স্বরগুলির সরল প্রয়োগ দেখেই এই জাতি সমূহের তাবৎ প্রযুক্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও দৃঢ় ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না। হয়তো এটি তাঁদের একটি বিশেষ স্তরের গান ; কিন্তু অন্য ধরণের গানও যে তাঁদের ছিল, সেটাও সম্ভবতঃ সত্য। সেগুলি রক্ষিত হয়ে আসেনি। যে সব জাতি সুদূর অতীতে একটি স্বরলিপির প্রথার উদ্ভাবন করেছিলেন এবং যাঁদের সাহিত্যবোধ তীক্ষ্ণ ছিল তাঁরা যে সঙ্গীত সংস্কৃতিতে কতকগুলি অর্চনাধর্মী মন্ত্র ব্যতীত আর কিছুতে অগ্রসর হননি। এখন বিশ্বাস করা কঠিন।

নারদী-শিক্ষা গ্রন্থের নারদ কে ছিলেন সে সম্বন্ধেও অনুমান ভিন্ন আর কিছুই করা যায় না। নাট্যশাস্ত্রে একজন গন্ধর্বজাতীয় নারদের কথা বলা হয়েছে, যিনি সঙ্গীতে অগ্রণী ছিলেন। এই শিক্ষাগ্রন্থেও নারদ নামক একজন গন্ধর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই পুরাণপুরুষের নামটিই এই শিক্ষাগ্রন্থের প্রণেতা গ্রহণ করেছিলেন। আদিতে সূত্রধর্মী স্বল্প কিছু শ্লোকে শিক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়েছিল ; পরে আরও কিছু শ্লোক এতে যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি অনুশীলন করলে এতে কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্থান পেয়েছে বলেও মনে হয়। নারদীশিক্ষা গ্রন্থটি দুটি প্রপাঠকে সম্পূর্ণ। প্রতিটি প্রপাঠকে আটটি করে কাণ্ডিকা আছে। গ্রন্থের

শেষ দুটি অধ্যায় বিশেষ চিত্তাকর্ষক, যদিও এতে প্রয়োগের ব্যাপার নেই। শিক্ষাকার নিজে শাস্ত্রজ্ঞানে সমধিক আস্থা সম্পন্ন হলেও গ্রন্থ সমাপ্তিতে স্বীকার করেছেন যে আচার্যের কাছে সাক্ষাৎভাবে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রধান কর্তব্য। তাঁর মতে, এই ধরণের প্রযুক্তি বিদ্যা কখনই উত্তমগুরুর উপদেশ ভিন্ন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু, তথাপি সামস্বরের তথ্য নিরূপণে তিনি স্বকীয় বিশ্লেষণরীতিকেও সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন।

নারদীশিক্ষার একটি টীকা পাওয়া যায়। এই টীকাকারের নাম ভট্ট শুভাকর বা ভট্ট শোভাকর। ইনি কোথাকার লোক এবং কোন সময় টীকা রচনা করেছিলেন বলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে ইনি সম্ভবতঃ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। এতদ্ব্যতীত এঁর টীকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য। এই টীকার সঙ্গে গবেষক বা মনোযোগী পাঠকের বহু স্থানেই মতানৈক্য ঘটা স্বাভাবিক। তথাপি, কয়েকটি ক্ষেত্রে এই টীকা আমাদের কাজে আসে।

বৈদিক সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা যেমন আমাদের সাহিত্য বা সঙ্গীতগ্রন্থাদিতে অত্যন্ত অল্প, তেমনি বহু শিক্ষাগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। ব্যাকরণ বা ছন্দশাস্ত্রাদির তুলনায় শিক্ষাসমূহের পর্যালোচনা নিতান্ত কম। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত বেদাঙ্গের এই শাখাটি একান্ত অবহেলিত রয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য শিক্ষাগুলিও প্রায়ই অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং বহুলাংশে অসম্পূর্ণ; নারদী শিক্ষাতেই কিছুটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রচেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু তাও সবক্ষেত্রে সমান নয়। এতৎসত্ত্বেও এই শিক্ষাগ্রন্থ থেকে আমরা যে সূত্র পেতে পারি তা অতিশয় মূল্যবান। সামগান বা ঋক্‌পাঠ যখন তথাকথিত গান বা আবৃত্তিতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে তখন তার স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করবার জন্যই এই প্রচেষ্টা হয়। সে যে ঠিক কতযুগ পূর্বের কথা তা নিশ্চিতভাবে বলবার মত ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কোনও কোনও পণ্ডিতের অনুমান এই শিক্ষাগ্রন্থ খ্রীষ্টজন্মের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বের রচনা ;—কিন্তু এটিও অনুমান ভিন্ন আর কিছু নয়।[১]

উত্তরসূরি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিতব্য শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রণীত 'বেদগানের রীতিপ্রকৃতি' গ্রন্থের মুখবন্ধ। : সম্পাদক

অমিয় চক্রবর্তী

হাজারিবাগ

আয়ু প্রান্তে এসে আজ মনে জাগে কৈশোর-যৌবনে
ছিলাম হাজারীবাগে, শৈল শ্যাম প্রান্তরে কলেজে
সেণ্ট্ কলম্বাস্ চূড়া উঠেছে শুভ্রের মহিমায় ;
পরিচ্ছন্ন ছাত্রাবাস কলধ্বনি মুখরিত। একা
স্নিগ্ধ প্রীতি পরিবেশে প্রথম আমার পরিচয়
আইরিশ কর্মী যাঁরা তাঁদের সেবায় শিখায়
নিত্য প্রেরণার সঙ্গ। ছিল যে দ্বিচক্রযান তাতে
যখন-তখন চলে যেতাম ছুটির প্রহরে
লক্ষহীন ঔদাস্যের উদার নীলাম্ভ সঙ্গ খুঁজি
পাথর পাহাড় আকাশিকা।
দুইতীর সে-জীবনে
সতীর্থ সঙ্গম আর আচার্য অধ্যক্ষমণ্ডলী,
আর ছিল রাত্রি জেগে পড়ার নিভৃত আয়োজন
ভোর হয়ে যেত কতবার।
মন্ত্রমুগ্ধ স্বপ্নচারী সেই দিন আজো
বিরাজিত। মুহূর্তের সুধা তারি বাহি
অবচেতনায় নিত্য।
যা পেয়েছি সেই রত্নরাজি
দোলে অবিলীন, মর্মে পারের ঘাটের
শুনি ছলছল ধ্বনি, ভাবি জীবনের পরিক্রমা
থাকবে না কোনো দিন।
জানি মাঝি হতেছে উতলা
যাত্রী যদি পড়ে থকে, মৌন তৃপ্তিহীন

স্মৃতি হতে নূতনের অন্য পারে কল্পনার খেয়া
তাতে যদি পার হই।
কোথা সে পারের প্রতিশ্রুতি।
এ জীবনে হল হল শুধু পারাপার মধুর সংসারে
দুঃখ ঝড়ে, শান্ত দিনে। হে জীবন প্রয়াসী প্রদর্শিকা,
দাও শেষ শঙ্খবাণী তাই শুনে অন্য তীরে যাবো
না জানি সে কোন্ অন্য ধন্যতায়॥

মণীন্দ্র রায়

নতুন প্রতীক

তুষারযুগের উপমানুষেরা
ছিল গুহাবাসে চালচুলো হারা;
বৃষ্টির দিনে খাবার খুঁজেছে
ফেলে রাখা বাসি মৃগয়ার হাড়ে।

তবু সে ছাড়তে চেয়েছে সবলে
জীবজগতের পাঁকের শয্যা;
গ্রীক নাটকের ফিউরির মতো
নিয়তিকে মেনে নেয়নি সহে।

অশ্রুর মেঘে সাদা আলো তার
সাতরঙে ভেঙে হয়েছে তেরছা;
সিক্ত আঁধারে অগ্নিশলায়
হাড়ে ফুটো করে বাজাল তূর্য।

লক্ষ বছর পেরিয়ে তবুও

মানুষের মুখে আদিম উক্তি!
ইলেকট্রনিক বোতামের চাপে
পৃথিবীকে ভেঙে ছড়াবে উল্কা?

বিবর্তনের এই প্রহসনে
মানুষী মেধা কী হয়েছে ফতুর?
দেখ-না রক্তে নতুন প্রতীক—
কে পথ রুখবে এ আরাফতের।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ছায়া

ক্লান্তি আছে জ্যোৎস্না আছে শীত আছে
তারই নানা ছায়া আরশিতে;
তোমার মুখেও এই ছায়ার আদলে
কিছু গড়ে ওঠে কিংবা ভেঙে যায়,
এখন জানার কথা নয়
ছায়াদের কি যে অভিপ্রায়।

নিজের ছায়াকে দেখে ভয়ে ভয়ে থাকি,
কখনো সামনের দিকে কখনো পেছনে
নিকট সঙ্গীর মতো হাঁটে, চলে, থামে;
এই ছায়া দীর্ঘ হবে নাকি!

বেশ তো ভালোই লাগে শেষ রৌদ্রে
গাছের ছায়ায় বসে থাকা;

অথচ সন্ধ্যার শেষে যখন মিলিয়ে যায়
বাইরের ছায়া,
নিজের ছায়াই শুধু বেড়ে ওঠে সঙ্গোপনে
চরাচরে, মনের ভিতর।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

করি নি তা

ঠিক সময়ে ঠিক যা করার করি নি তা।
ঠিক সন্ধেয় ঠিক তারাটি লক্ষ্য করে
অন্ধকারের আকাশ হাঁটা,
সঠিক পানের কলি ভেঁজে মনকে ছোঁয়া,
শীতে হাওয়ার হাত বুলিয়ে ঠিক-ঠিক ধান ঘরে তোলা—
করি নি তা।
যা করেছি তা-ও সেরেছি আধো-বাধো,
কিংবা শুরু করেও শেষের পথ ভুলেছি।

ছাতিম-বকুল-হিজল পাতায় পিছলনো রোদ নীলকণ্ঠ,
ক্বচিৎ দোয়েল হারানো সুর ট্রাফিক-সেতার সঙ্গতে তার,
বৃষ্টি কখন ঝুমুর-ঝুমুর সন্ধের ডাক-রানার পাঠায়—
ঘরবন্দী যাচ্ছি-যাব জীবন আমার
চোখধাঁধা এক কানামাছি।

আকাশ আমার অনন্যোপায়—সেই আকাশে দৌড়ে যেতে
মাঝপথে পা-হড়কে সিঁড়ি অদৃশ্য, ঘর মুখ-ফেরানো,
শুরু এবং শেষের মধ্যে অবলম্বন 'আকাশবাণী'
'দূরদর্শন' দৃষ্টি-শ্রুতি হাঁটকে ফেরে—

আকাশ থেকে যায় আকাশে, আমি থাকি।

বাইরের ডাক শুনতে পায়ে মনের পিছুটান বেঁধেছি,
মনতলানি ডুবজলে ভয় পেয়ে পাই নি পাতালপুরী,
এমনি দ্বিধার এপার-ওপার সময় কাবার—
ঠিক সময়ে ঠিক যা করার করি নি তা।
এক জীবনের গুহামুখে হাজার জীবনসমুদ্রকে
ঝাপটদাপট অলৌকিক এক উল্লাসগর্জনকে ধরা—
করি নি তা।

চিত্ত ঘোষ

চলে গেছে

একটা পোড়া দিনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি
চন্দন লেপে কে আমার চোখ ঠাণ্ডা করে দেবে!
দুর্বাঘাসের রঙ আর কোমলতার ভোর
নদীর জলে গড়ানো বেলা
গাছের মুখ পল্লব দেখে
আমার রক্ত স্নায়ুর মধ্যে কাঁপে।
বৃষ্টিতে ভিজবে বলে মেঘের নীচে অনেক পাখী
জলের কমনীয় আর্দ্র গন্ধ আমি পান করি
ভেতরে ভিতরে সময়ের ক্ষয় বাড়ে।
ঘট বসানো দরজা বন্ধ
শাঁখের শব্দ কখন থেমে গেছে
উঠোনে পায়ের ছাপ রেখে
চলে গেছে সবাই।

অতীন্দ্র মজুমদার

বৈশাখের শেষ দিনে

কোথায় পালিয়ে গেছে নাগচম্পকের গাঢ় গন্ধ। কোথা থেকে
জ্যৈষ্ঠের আগুন এল, লাবণ্যের গভীর করতোয়া
পাড়ের ঢালুতে রুক্ষ, আঙুলে কুষ্ঠের ক্ষত—দেবকন্যা যেন
শুকনো ঘাসে দগ্ধ তনু শ্মশানকালির জিভে ছোঁয়া॥

কোথায় হারিয়ে গেছে সূর্যাস্তের সোনার কুসুম, শালগাছে
অসময়ে অন্ধকার, শষ্প শষ্য চেয়ে আছে শূন্য মাঠে, তীব্র বুভুক্ষায়
প্রার্থিত শান্তির জল রুদ্ধ সেই রাত্রির চোখের
গভীরে লুকানো বজ্র-বিদ্যুতের লাস্য মহিমায়॥

কৃষ্ণ ধর

কিতাবমহলে অট্টহাসি

বুকশেলফে পাশাপাশি পরস্পরের গায়ে
গা মিলিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকেন
আমার প্রিয় লেখক, কবি, দার্শনিক বিজ্ঞানীরা।
আপাতত তাঁদের মধ্যে কোনো অমীমাংসা নেই
ওঁদের সব প্রশ্ন আমার মগজে মৌমাছি
হয়ে দিনমান দংশায়।

চাঁদনিচকের জহরুল ওস্তাগরের হাতে তৈরি
শেলফটা এখন খুবই সঙ্গত অহংকারে
একা একা দাঁড়িয়ে আছে পড়বার ঘরের কোণে।
মাঝে মাঝে তার বুকে সময়ের স্রোত

আচমকা এক একদিন বান ডেকে আনে
যখন কোনো প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে আমি
সব ওলট পালট করে দিই।

মরক্কোচামড়ায় বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা
এই কিতাবমহল তিন পুরুষের স্বাক্ষর
বুকে নিয়ে আমার ব্যাপারস্যাপার দেখে
এক একদিন মুচকি হাসে।
আমি তা উপেক্ষা করে নিজেকে মস্ত পণ্ডিত
ভেবে নিয়ে জটিলতম দার্শনিক
তত্ত্বের বিচারে নিমগ্ন হই।

আমার ঘরের সামনেই এজমালি রোয়াকে
তুমুল বিতর্ক জমে ওঠে তাসের
তুরুপ ঠিক সময় মারা হল কিনা তা নিয়ে
আমি এই সব তুচ্ছতায় তখন খুবই
বিপন্ন বোধ করি।
যেমন আমার বিজ্ঞতায় জহরুলের মেধা আর
ঘামের বিনিময়ে তৈরি
বুকশেলফে গাদাগাদি করে সহাবস্থানে থাকা
প্রিয় কবি, গল্পকার, দার্শনিক বিজ্ঞানীরা
নিশ্চিন্তে কালের করতলে মাথা রেখে
নীরব অট্টহাস্য করে
আমার প্রণম্য পিতামহের অয়েলপেন্টিংটাকে
অকস্মাৎ কাঁপিয়ে দেন।

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার থেকে অন্ধকারে

গোপন মনের মধ্যে আজ যাবার দিনে
যারা ভিড় করে এসেছিল, তাদের কথা
প্রায়ই মনে পড়ে।
সেই কাঁদা-হাসা দিনের সূর্য্য ওঠা প্রভাতে
আমার মনে স্বপ্নের ছোঁয়া নিশ্চয়ই
লেগেছিল।
আমি অবাক বিস্ময়ে আমার মনের দরজা
খুলে দেখেছিলাম
কি যেন একটা ছবি।
আজ মুছে যাওয়া সেই সব ছবির
স্পর্শ দাগটুকু আমার মনের নিভৃত কোন থেকে
সরে যেতে পারেনি।
আজো তারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে
শুধু এই ইঙ্গিত করছে—ভুলে যা রে
সব ভুলে যা।
ওটা খেলাঘরের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ যারা সামনে, আবার যারা পিছন দিক থেকে
উঁকি দিয়ে আসছে
হয়ত তারাও আবার আমার সামনে দিয়ে
চলে যাবে ছবি রেখে।
আমি যতটুকু আছি ততটুকুই নিয়তির
বরপুত্র।
তারপর অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
সেই শেষ বিন্দুতে মিশে যাব।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কেউ ডাকেনিক'

কেউ ডাকেনিক এইখানে আমি নিজেই এসেছি।
পাখি-ডাকা এক সকালে যখন ঝুমকোলতার
ডাল নুয়ে ছোঁয় পুকুরের জল—আমি ছুঁয়ে গেছি
এই তীর, এই বনশিউলির ডাল থেকে লাফ দিয়ে মাছ-রাঙা
মাছ নিয়ে উড়ে পালায়,—বিগত জন্মে আমার
শালুক-জাগানো পুকুরের ভাঙা-ঘাটের রানার
পাশে ছিল না-কি ঘন-ঘাসে-ঢাকা একফালি ডাঙা,
টালি-ছাওয়া বাড়ি আমারও ? চৈত্র শেষের হাওয়ায়
এ-সব দৃশ্য তাইতো মনকে কেমন করায়।

মঞ্চ সাজানো এসব দৃশ্যে ছিলাম আমিও
এক কুশীলব—স্বর প্রক্ষেপে, চলনে-বলনে,
অঙ্গ সঞ্চালনেও ছিল তো জাদু সক্রিয়
দর্শকদের মন মজাবার। হয়তো সেদিন তাই একজন
হৃদয় উজাড় করে দিয়ে কাছে টেনেছে আমায়
সোনা-ঝরা সেই চল্লিশে ! মনকে কেমন করায়
এ-সব দৃশ্য, যখনি ভেবেছি কী-ই বা পেলাম !
পাখি-ডাকা সেই সকালে এখানে একদা ছিলাম।

দুই বাহু তার ছিল যে আমার পিয়ালের শাখা
যা দিয়ে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে করলো আপন,
সাক্ষী রয়েছে বকুল-ছড়ানো এই মাঠ-বন—
আমায় দিয়েছে অনেক, তাই কি নাম-ধরে ডাকা
এখনো রয়েছে বকুল-গন্ধ ছড়ানো হাওয়ায়
এসব ভাবনা মনকে কেমন, কেমন করায়।

হিসেবে দেখছি পেয়েছি অনেক, দিইনি কিছুই—
যেমন হঠাৎ জল থেকে মাছ নিয়ে মাছ-রাঙা
নিমেষে পালায়—আমিও চকিতে ভাসিয়েছি ডানা
একদা, আমার চেনা এই মাটি, বিদেশ বিভুঁই
নয়, নয়। আমি আরেক জন্মে তারে যেন ছুঁই।

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

দুটি রূপদর্শী

সেই আমি

আত্মমাটি
পিছে ফেলে ধাই পরগামী
প্রজাপতি। তরঙ্গপ্রপাতী
বর্ণজালে উড্ডীন অনামী

এই আমি। মুহূর্তে সৈকত
ছুঁই। নিভৃতে পড়ন্ত রোদে
পিঠ রেখে আসনিত, শ্লথ
চক্ষে ডুবি। ব্যক্ত নামপদে

এতাবৎ এ। পতঙ্গিনীকামী
সেই আমি॥

বিপুল বিমুগ্ধ পুরী

বিপুল বিমুগ্ধ পুরী। মজে
মন মর্মে, কোলাহলি বাসে
গর্তক্লিষ্ট পা:-পক্ষী তরাসে
গন্ধী বর্ণ্যে, প্রবত্ত ছিন্ন ত্রজে।

মজে ক্ষিপ্ত সুবাধ্য জঠর
অনুপনে। চিত্তজয়ী নেশা
তুঙ্গে চড়ে। পপাত হামেশা
মোক্ষ পায়। আর পুরীবর

জর ঘোরে ধায় ভেঁরো লোক
দ্রুত লয়ে—শোনে পুণ্যশ্লোক ॥

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

দুই পুরুষ

স্বপ্নপুরী ছিল একদিন
এখন সে ভূতে-পাওয়া বাড়ি
সম্ভ্রান্ত শতাব্দী অবসানে
সেদিনের স্বজন ফেরারী।

শূন্যগর্ভ পিতৃসত্য আজ
পিতাপুত্র দ্বৈরথ সমরে
হতবুদ্ধি বিভ্রান্ত সময়
বিরোধ ঘনায় ঘরে ঘরে।

সুন্দরের ধ্বজা অবনত
কী উদ্‌ভ্রান্ত উত্তরসাধক
সততা সতত পরাহত
রাজদণ্ড হাতে সে ঘাতক।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শরিকানা

তিনি তিনভাগ দিয়ে এক ভাগ রেখে দেন
কখনো সবটা দেন না
সেই অভাববোধের জুতোর পেরেক, চালের কাঁকর,
পিঠের ওপর গা-শিরশির
থাকছে ত থাকছেই
আমার নিবিড় সুখের মধ্যেও
কোনখানে এক স্মরণের মরুভূমি পেতে দিলেন
যার ওপর বাবলা ক্যাকটাস
বৃহদাকার উট হেঁটে যাচ্ছে
আমি একভাগও কেন কেড়ে নিতে পারছি না
স্তোকবাক্য দিয়ে
না হয় তিনভাগের একটু ছেড়ে দিয়ে
একটা গোটা একভাগ যদি পাওয়া যেত
তাহলে কি ঐ একভাগেই
দেখতে চান ফুল ফোটাতে পারি কি না
পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফের স্পর্শ
যা তিনি সহজেই বিস্তৃত রেখেছেন
আমাকে তিন ভাগ দিয়েও।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অনুতাপ

(হিমতীর্থ কেদারনাথের স্মৃতি থেকে)

যেন পাথরে বসেছে এসে নীলাকাশ,
বরফের জমাট সংশ্রবে সাদা আরো শ্বেত হলো
মেঘ এইবার তাকে করবে বর্ণনা।
আমি কি এবার অগস্ত্য উত্থানে উঠে যাবো
মহাপ্রস্থানে যেমন যেত মহাভারতীয় বীরত্বের খ্যাতি,
নাকি বরফই পাথর ছিঁখে মেঘ শিখে
লিখে দেখাবে আমার একান্ত কিছু গাঢ় ঘুণাক্ষর!
দেখা আর লিখে রাখায় যে কতো তফাৎ!
তবু কবিতাই লেখা হবে
এবং পাথর উঠবে কেঁদে ঝর্নার সজল বিবেচনায়,
ক্লান্ত মানুষ নীরবে তার নত মাথা পেতে
তুলে এনে বসাবে অভিভাবক প্রাচীন স্বদেশী নীলাকাশ।

সমতল মাটিতে যখন শরীর প্রমত্ত করি
তখন কিছুই আর মনে পড়ে না তো!
এতো শব্দের লোলুপ লিপ্সা, ডাগর চোখের
জল-ছোঁয়া সাগর, সূর্য আর পূর্ণিমার নলিনাক্ষ আলো
ক্রমশই নীল হয়ে লীন হয়, ভালবাসার উদ্বৃত্ত থাকে না কিছুই,
যখন শরীর ভাঙি তখন পুরুষ ছাড়া
অন্য কোনো সর্বনাম মানাবে না আয়ুর ক্ষণিক পৃথিবীতে,
তাই ঈশ্বর পাথর শিখে, বরফের গায়ে লেগে
ছিটকে ওঠা রৌদ্রের রক্তোচ্ছ্বাস দেখে
সমতলে যে ফিরে এসেছে, সে ক্ষরণসমাপ্ত কোনো
গৌণ পুরুষ নয়, সে কবি নয়, এমনকি সম্পূর্ণ মানুষও নয়

তার চোখ ছাড়া সর্ব অঙ্গই তখন অনুতাপে কাঁদে।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্লি

১৯৪৭ সাল—রক্তের শপথ—মনে আছে ?
দুঃখ পেয়েছিলে
ভারতবর্ষের জন্য কোথাও ইস্কুল নেই
সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা চাই সভ্যতার বিশ্ববিদ্যালয়
—শাসনবিহীন পর্বে স্নেহের সাম্রাজ্য স্বপ্নে—
রক্তের শপথ—মনে আছে ?

১৯৮২ – ১৯৪৭ = ৩৫ বছুরে স্বপ্ন দিন গোণে
ফুটপাতে গেঞ্জির দোকানে
পাশে দশ বছুরে স্বপ্ন ডাগর নয়নে চেয়ে আছে

বিশ্ববিদ্যালয় চার্লি
’৮২ সালেও দেখো নয়নে পুরুষ্টু কালি টেনে
অশ্রু ঢাকে লজ্জায় ঘৃণায়।

সুশীলকুমার গুপ্ত

মানবিক

শুধু সেতু মেট্রোরেল রকেট জাহাজ টি ভি নয়,
নয় শুধু রাজপথ অভ্রচূড় অট্টালিকামালা,
রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তির সনদ ;
সেই সঙ্গে এল
আরো পঙ্গু প্রতিবন্ধী মানুষের দল,
সৃষ্টিথেকো পঙ্গপাল, সভ্যতার অনাথ আশ্রমে

ভবিষ্যৎ বংশধর, শতাব্দীর কসাইখানায়
আরো অসহায় প্রাণ, কৃষ্টির শ্মশানে
আরো সামাজিক শব, শোকযাত্রা, মগ্ন হিমঘরে
আরো বাসী শস্য, বিশ্বমঞ্চে আরো পটু বিদূষক।
এ সভ্যতা কবে
পাবে প্রতিরোধ শক্তি মানবিক প্রেমে জ্ঞানে দ্বন্দ্বসমন্বয়ে ?

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরের মার্জনা

বয়সের হাত ধরে
আসেন ঈশ্বর।

যে কিশোর,
অনায়াসে ঢিল ছুঁড়ে
উড়ন্ত বিহঙ্গে করে চকিতে হনন

যে যুবক,
দেহের দুঃসহ তাপে
অবাঞ্ছিত ভ্রূণে
অনায়াসে খুন করে
ভাসে প্রিয়ার প্রণয়ে

সেই শিশু—
একদা যে ঈশ্বরপ্রতিম
ক্ষীণ দৃষ্টি প্রবীণ বয়সে

বিক্ষত হৃদয়ে
কৃতাঞ্জলিপুটে মাগে
বিপুল মার্জনা।

হা ঈশ্বর,
ওরা পায় কিসের করুণা?

জানি না এখনো আমি,
ঈশ্বর আছেন কি না
কে বা পায় ক্ষমা ;
অথচ নিশ্চিত জানি

দিনে দিনে পাপ শুধু
জমা হতে থাকে।

আদিনাথ ভট্টাচার্য

রক্তের ময়ূর ১

গিরিখাতে গর্জমান
সমতটে কল্লোলিত
আমাদের অন্তর্গত নদী
মোহানার মুখে এসে ভারাক্রান্ত পৃথুল স্তিমিত
মাঝে মাঝে চর জাগে
উঁচু ডাঙা আষ্টেপৃষ্ঠে নিবিড় বন্ধন
যাকে দ্বীপ বলে।
বিবিক্ত বিজন সবুজ আঁধারে ঢাকা
সেইখানে ঘন বনানীর ফাঁকে

উচ্চকিত গাঢ় অন্ধকারে
একটি ময়ূর ঊর্দ্ধমুখে
সাতরঙা আলোর পেখম মেলে দিয়ে
ক্ষণে ক্ষণে ডাক দেয়—
সে আমার রক্তের ময়ূর।

রক্তের ময়ূর ২

সুদূর অস্পষ্ট সময়ে কিছু কিছু রক্তের কথা শুনতাম—বীরের এ রক্ত স্রোত শহীদের খুন আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব। যেহেতু সময় ছিল অবুঝ এবং অর্বাচীন, কে কাকে কখন কেন কীভাবে রক্ত দেয় জানিনি বুঝতে পারিনি। তারপর···ধনধান্যে পুষ্পে ভরা সার্থক জনম আমার দুম করে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা—
যার জন্য রক্ত দেওয়া সে এখন রক্তের অতীত
কেননা আমরা জেনে গেছি বুঝে গেছি
রক্তাভাবে এখন সে মরে না কখনও,
কিছু চুক্তি কিছু যুক্তি কিছু বুদ্ধি দর কষাকষি
স্বাধীনতা বেঁচে থাকে স্বমহিম প্রত্যয় বিবরে।

রক্তের চাহিদা তবু সীমাহীন বেড়ে যায়
দেয়ালে দেয়ালে
ভুসো ভুসো রঙচটা বাঁকাচোরা বিকৃত ঘোষণা
রক্ত চাই রক্ত চাই রক্ত চাই
বিনা রক্তে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী
বিনা রক্তে নাহি দিব তৃণাগ্র জলধি
বিনা রক্তে নাহি দিব তিলার্ধ আকাশ।
রক্তমূল্যে বর্ম কিনে মুড়ে রাখা নির্মূল সত্তায়

অন্ধকার শীতলতা শ্রান্তি ক্লান্তি ঘুমের বিছন
ঈর্ষার নিড়ানি ঘৃণার সার প্রেমের নিষেক
প্রতিপলে বাঁচবার বর্গাদারী পাস্তর ফসল।

রক্তশূন্য পোড়া ঘাস পোড়ো জমি
পা ফেলে চলতে চাও বাতাসে নিঃশ্বাস চাও
রক্ত দাও শুধু রক্ত দাও।

এত রক্ত কোথা পাবে ?
আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে
সুরঙ্গের আঁধার বাজারে
রক্তের তবুও ছড়াছড়ি।
কী করে চাইতে হয়
কোন পথে পাওয়া যায়
যে জানে সে পায়
অবিশ্রান্ত ধারাপাতে অনর্গল বন্যার মতন
যা দিয়ে নদী গাঙ মাঠ ঘাট
অনায়াসে সমুদ্রে বিলীন—
সে সমুদ্রে ঘাটে ঘাটে একযোগে
করযোড়ে স্তোত্র পড়ে সুমহান ঐতিহ্য প্রাচীন
ভেসে থাকে সাঁতরায় মগ্নসুখ গণতন্ত্র যুবা
হাঁটুজলে খেলা করে লম্ফমান বিপ্লবের শিশু।

দিগন্ত রেখায় শুধু বসে থাকে অসীম ময়ূর
রামধনু পেখমের নিচে অতি যত্নে ঢেকে রাখে
নীরক্ত ধূসর দুটি অসহায় দ্বীপ
রক্তমগ্ন চৈতন্যের থেকে জেগে ওঠে যারা
আগস্টের অলস বেলায় কিংবা
অবিরত দামামার শীতল প্রহরে।

সামসুল হক

পাখি

জানলায় বসেছে পাখি হুবহু ইবন্ বতুতার গাঢ়তায়

ভূমধ্যসাগর আর চাটগাঁর বাতাসের আঁশ
তার ডানা থেকে তুঘলকের রাঁধুনি খুব খসাতে পারেনি
কতোক্ষণ ও ব'সে থাকবে জানা নেই
জানলার নিচের দিকে আসামের তাঁতশিল্প রঙিন চিৎকারে তরস্থান

এখন সকাল না-কি দুপুর হয়েছে
পাখিটাকে অতিক্রম ক'রে কিছু বোঝাই যায় না
এখন কি আমার চা-খাবার সময়
আজ কি আমরা কেউ খবরের কাগজ পড়েছি
মিস্ত্রির কি আজই আসার কথা ছিলো

জানলায় বসেছে পাখি হুবহু ইবন্ বতুতার গাঢ়তায়
জানলার নিচের দিকে আসামের তাঁতশিল্প রঙিন চিৎকারে তরস্থান

আমার এখন কিছু ভাঙতে-চুরতে ইচ্ছে করছে।

শক্তিব্রত ঘোষ

শব্দ, মুখরতা

আমি চাই মাঝরাতে নিঃশব্দ থেকে উঠে
শব্দ হতে। কিন্তু ততক্ষণে
সারা রাত গ্রহতলগত। রাজার বদল হলে
কিছু উত্তেজনা বাড়ে।

মাঝরাতে ঘরে থাকা ভাল,—ঘরের মধ্যেই
শব্দ হওয়া, কিন্তু তাতে
কারো ঘুম ভেঙে যেতে পারে।
মানুষ অর্ধেক বাঁচে ঘুমে, অর্ধেকটা বোবা হয়ে বাঁচে,
এর মাঝে শব্দ হব কেন ? শব্দ হতে হবে বলে শব্দ হওয়া ?
মনে হয় দরকার—নিজের জন্যেই—শব্দ হওয়া—
শব্দ হয়ে অন্য ঘুমে থাকা।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

গৃহত্যাগ

গত বছরের সংগে এ বছরের তফাৎ অল্পই।
শুধু
বড় বড় ঘর ছেড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যারা নামল
তারা উঠল না আর।
কয়েকটা কেঁদো ইঁদুর
নিচে রেস্তোরাঁ আর উপরে বসতবাড়িতে
যাতায়াত করত ইচ্ছেমত—
তারা প্রশস্ত নির্জনতা দেখে
ঘটনার পর্যালোচনা করল
স্থির হল—
পুজো পর্যন্ত তারা নতুন ভাড়াটের জন্যে
অপেক্ষা করতে পারে—
তার বেশি না।

বাসুদেব দেব

ঘুম

সমস্ত লেখার মধ্যে একটা ছটফটে টাইমপিস ঘড়ি
মজা করে ঘণ্টা বাজাতে থাকে
ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় ভরে যায় আমার মধ্যরাত

তুমি তখন চুল খুলে দশতলার ফ্লাট বাড়িতে ঘুমোও
লাল চটির কাছে পড়ে থাকে এক টুকরো তারা—
এক কুচি কাগজ উড়তে উড়তে
শেষে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে আমার বুকের খানাখন্দে

তুমি ঘুমাও।

রাখাল বিশ্বাস

নিগূঢ় সে খেলা

আমার ভিতরে আজ ভয়ঙ্কর এক খেলা, নিগূঢ় সে খেলা
জলপ্রপাতের মতো নেমে এসে ছুঁয়েছে জীবন
অন্য কিছু ছোঁয় না সে, সমুদ্র চেনে না
আমি দূর থেকে দেখি, তার মুখে বিষাদের গন্ধ লেগে আছে

জীবনের শাদা জুড়ে অন্ধকার চরাচরে আগুন জ্বেলেছো
পরিত্রাণ নেই তার, ভাগ হয়ে গেছে জানি দীর্ঘ সমারোহ
সর্বস্ব কেড়েছে পাপ, তোমার জীবন জুড়ে এতো পাপ ছিল?
মর্মরিত ওই শব্দে কেন তবু এতো শব্দ হয়
উঠোনে ভোরের আলো আছড়ে পড়ছে
কোলে তুলে নেবে না কী? কথা ছিল একদিন কোলে তুলে নেবে।
জীবনের স্থির ছবি টুকরো করেছি তবু নখের আঁচড়ে।

আমাদের এতো গান তুমি বলো কোন্ গানে মিশে যাবে আজ
যার কাছে বার বার ফিরে যাবো, স্নান সেরে ফিরে যেতে হয়
নিজস্ব ভাষার কাছে তৃপ্ত হতে নিজস্ব নীলিমা।

দাউদ হায়দার

দিগন্তে লাঞ্ছিত রাত, উদ্ধত পরাজয়

তুমি যদি চাও, দিতে পারি রাজ্যপাট, আর
যা কিছু চাহিদা তোমার, সব কিছু—
উদ্ধত বরাভয় থেকে ফিরে এসে দেখি জ্যোৎস্নার
বিবর্ণ আলোয় নদীও অদ্রোহ, মাথানীচু
যেন শৈবালে ঢাকা আছে অনন্ত নিশীথ।

দিতে পারি অশ্রুর জোয়ার, উত্তরঙ্গ ফুলঝুরি—
শিকড়ে পড়েছে টান, তাই যাবতীয় ভিত
নড়ে গেছে, আর মৃত্যুর মজুরি
ছাড়া পাষাণও অনড়, শিলাময়।

—দিগন্তে শুধু লাঞ্ছিত রাত, বরাভয়ে উদ্ধত পরাজয়।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মড়া

বানের মড়া ভেসে গেছিস
বেশ করেছিস,
হয়তো শেয়াল, নাহয় শকুন

চেটেছে নুন
তোর শরীরের।
ভেবেছিলি, মানিকপীরের
দোয়া হ'বে? ফিরবি আবার?
দশটা বছর হ'লো যে পার!
পেনিফ্রকের গোলাপ ফুঁড়ে
হল্দে পোকা খাচ্ছে কুরে
গায়ের গন্ধ,
অথচ তুই মায়ায় অন্ধ
হাতড়ে খুঁজিস পুরোনো ঘর,
যীশু নাকি, ভাঙবি কবর?
আমার মন্ত্রে শব্দ বাঁচে,
তুই পুড়ে যাস বুকের আঁচে।

শম্ভু রক্ষিত

আত্মপ্রকাশ

আমার শরীরের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্রতত্তম।
মাতাল খাদে, অন্ধকার ভয়াবহতায়, বুকের ভিতর পথ চলা এখন কেবল।
এখন আমার কান্না দেখে আর বিদ্রূপে হেসে ওঠার মত জেগে নেই কেউ
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে যাওয়া পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মপ্রাণ ফিসফিস করে উঠছে শুধু
অনুষ্ণ শোণিত ধমনী এখন কাঁটা ভাঙা কম্পাস
যেন ধাতুর কাঠিন্য কিংবা কোনো পাহাড় ভেঙেছে যেন মাথার ওপর।

এখন আমার সামনে কেউ নেই—স্বর্ণলোভী জাদুকরী কোন নারী নেই
[অন্ধকার লুপ্ত-নক্ষত্র, বিরহ যৌন কোলাহল, নির্জন নদী, প্রাকৃতিক রমণী?]
শুধু ঈশ্বরের মুখ চতুর্দিকে দেখা যায়।

এখন চামড়ার ভেতরে পথ—
অন্ধকারে ক্লান্ত মৌলবীর মতন এখন আমার চোখে বাণী-অন্বেষণের ব্যাকুলতা
বিপন্ন দেহে নিঃশ্বাসে গলিত লাভার উষ্ণতা-মৃত্যুর অবয়বী।

যেন এক অলৌকিক মেঘ পাহাড়ের নিঃসঙ্গ পথ
যেন দূর থেকে দেখা আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাটির মত
শব্দহীনতার মধ্যে সতর্ক চোখ রেখেছেন ঈশ্বর
যেন বহুকাল আগেই ঈশ্বর এসে বাতি জ্বেলে রেখেছেন।

এখন বুকের, সাগরের ঝড় আর ঝাউবন সরালে
ভণ্ডামী লাম্পট্যের পাশাপাশি কয়েক হাজার আত্মার নিঃসঙ্গ চিৎকার…
চিৎকার, শ্রান্তি, দ্বেষ, পাপ, ক্রোধ এবং কিছু সামসময়িক
এবং পরিত্যাগ, বিরোধিতা, নষ্টামী ও রক্তপাত ।
মৃত্যুদিনের পোশাকে নাচে আমার কঙ্কাল
এবং সবার নীচে মুখ থুবড়ে পড়া অলীক একাকীত্বের—
আমার উৎকর্ণ মৌন স্তব্ধতার কেন্দ্রবিন্দুতে পলিমাটির মত তরল শীতলতা।

প্রথম নির্ভরতার অলসতায় মাটির ভেতর ভেসে যায়—
আমার হাড় হাভাতে প্রাণকণিকার ধুষ্ট বহ্নিগুলো।
এই ভাঙা-হৃৎপিণ্ডে লালের কোন চিহ্ন নেই আজ
আত্মায় কোনো শব্দ নেই, প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, রক্ত নেই
মাতৃগর্ভের কোনো দুঃখ নেই
আমাকে এই শব্দহীনতায় একলা ফেলে আমার রক্ত চুষে নিয়েছে ঈশ্বর-কুকুর
প্রতিটি ধমনীর রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে শ্মশানাভিমুখে।

আমি ঈশ্বরের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত আত্মপ্রকাশ করেছি গতকাল।

অলকেন্দুশেখর পত্রীর দুটি কবিতা

বেদনা ভাঙায়

নিউট্রন, এখন কিংখাব থেকে বেরিয়ে এসো। সময় হয়েছে।
বুদ্ধিজীবিরা এখন যখন মৃত শরীরের কোন অংশটা কাড়াকাড়ি করবে ঠিক
করতে পারছে না।
এমন বর্ণাল সময়ে, নিউট্রন, কিংখাব থেকে অস্ত্রটা বার করো।
সময় হয়েছে। যা প্রেম।

হোক বৃন্ত খণ্ড।
হোক কাগজ কিংবা কাচ।
চতুর্দিক যখন বর্ণহীন নিরক্তকে আবার জাগিয়ে রাখার কাটা ডিমে তা
আইনস্টায়িনিয়ান শতাব্দীতেও,
সেখান থেকে নিউট্রন ফিরে এসো আমার আকাশে
নীলকে নিয়ে রচনা করা যাবে। যে নীল দেখার জন্য পুরুষ কখন এক
নারীটির মধ্যে চলে যায়
পুনরায় পৃথিবীর মুক্তিসূর্যে পরের দিনের ভোরটাকে দেখা বেদনা ভাঙায়।

আজ সময় ভাঙা

ফুসফুস উদাসীন নয়। নক্ষত্রও নয়। বাস্তব এক যুসাম্বিরের মাংসল অঙ্ক
ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চক রচনা করে
লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ড্রইংয়ের মত।

আজ সময় ভাঙা। সময়ের দিকে তাকিয়ে দেখছি ফুসফুস ভেঙে পড়ছে
ভীষনভাবে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল তবু সেই পুরনো সুরেলা গান। আর,
আজ, সময় ভাঙা রক্তে লাল, লঙ্ মার্চের পদধ্বনি আমাদের বেদীতে এখন।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের ভেতরে

স্বপ্নের ভেতরে আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না
কেবল আমাকে দেখি—কেবল আমাকে
উল্টেপাল্টে ঘুরে ফিরে নিরেট আত্মজীবনী
স্বপ্নের ভেতরে আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না।

স্বপ্নের ভেতরে খসে পড়ে আমার নকল পোশাক
আমার সাজ সাজঘর ফেটে যায় বুদ্বুদের মতো
আর তক্ষুনি বজ্রাঘ্রানে পদযাত্রা চুপ হয়ে যায়
অনন্ত শূন্যের দিকে উড়ে যায় হাতের রাইফেল
বুকের দীক্ষিত জবা ধূলায় লুটায়।

স্বপ্নের ভেতরে আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না
কেবল আমাকে দেখি—কেবলই আমাকে।

বেণু দত্তরায়

সে গ্যাখেনি

গোলাপকুঞ্জের দিকে নারী ছিল, চন্দনচর্চি
তার হাতে নির্জনতা—
সে গ্যাখেনি
সে ঘুরেছে অনেকদূর বাইরে-ভেতরে
উজ্জ্বল ছবির মতো
রক্তের ভিতরে তার
ঝরে পড়েছে কথকতা
ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ছন্নপাপে—

তার অভিমান তাকে স্পর্শ করে জোনাক জেলেছে
পায়ের পাতায় ছিল কাঁটা-লতা
ছিল গূঢ় তাপ
যৌবনের জলসাপ তাকে স্পর্শ করে ঘুরে গেছে
সে ছাখেনি
পালিত মাদারে ছিল লাল পাপড়িগুলি—অগোচরে
আজো ঝরে থাকে
দিনের প্রথম বাস ধরে সে স্বগ্রাম ছেড়েছে—
তার রক্তে রুমাল নেড়েছে জাদুকর,
মফঃস্বল শহরের হ্যাড়া পোড়া বটগাছ দেখেছে সে
প্রথম আশ্বিনে
আতাম্র পাথর গিয়ে ছুঁয়েছে পাহাড়ে
সম্রাট ডেকেছে তাকে – তার কাছ থেকে
যুদ্ধ ফল চেয়ে নিচ্ছে কবচকুণ্ডল—
রথের চাকায় তার জন্ম শাপ
ভয়ানক জহরব্রত জলে উঠছে রক্তের তিমিরে
মোগলসরাইয়ে গিয়ে ফিরে এলো
হাত ধুয়ে—দেখে ও ছাখেনি

সুব্রত রুদ্র

চিহ্ন

এরকম জুতোর মধ্যে
মানুষকে রেখো না ;
বড়ো সাংঘাতিক

ক্ষমতা নিয়ে এসেছে,
দুটো হাতেই সেই চিহ্ন।

আজো এমন কোনো মানুষ জন্মায়নি
যার হাতে আদিম চিহ্ন নেই !

মিহির ভট্টাচার্য

বিষণ্ণ প্রবাস

কি হবে বলো আর মুগ্ধ থেকে এ বিষণ্ণ প্রবাসে !

মুগ্ধতাই জীবন।
দুরন্ত যুবক তাই দিশেহারা মুগ্ধ আবেগে
জীবনের অর্থ খোঁজে।
নদী মানুষ পাহাড় সবুজ বনানী
কি গভীর বিশ্বাসে, ভালোবাসায় তার বুক ভরে রাখে।

তারপর, মুগ্ধতা ফুলের কাঁটা
বিশ্বাস ভালোবাসা মানুষ প্রকৃতি
অন্ধকার প্রেক্ষাপটে এক প্রবাসী জীবন।

কি লাভ বলো এ বিষণ্ণ প্রবাসে !

শিখা সামন্ত

এক মানুষের গল্প

তারা ভর্তি আকাশের তলায় দাঁড়িয়েছিল
একজন মানুষ
তার পায়ের তলায়, আধ ইঞ্চি জমি

তার স্বপ্নে, একটা গোটা আকাশ
তার বুকের ভেজা ঘামে শুয়ে আছে
একটা ন্যাংটো বালক
সে দাঁড়িয়েছিল তারাভর্তি আকাশের তলায় ;

তারা জ্ব'লছে, তারারা জ্ব'লছে
কালো চোখে মানুষটা ত্যাখে
কেমন যেন হাসে
তার পায়ের তলায় আধ্ ইঞ্চি জমি
তার স্বপ্নে গুটিয়ে আছে গোটা আকাশটা
বুকে এক রক্তঝরা পালখ আঁকা
হাতের মুঠোয় একটা কংকাল
মুখে হাজার অস্ফুট ধ্বনির সুতো
সে বোবা নয়

স্বপ্নের ইমারতে এক একটা পা ফেলে এগোচ্ছে
তলার মাটি স'রে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে
'গোলাপ গোলাপ' বলে কাকে ডাকছে
কাকে

মুকুলদেব ঠাকুর

কেউ মনে রাখে না

কেউ মনে রাখে না কাউকে, কেউ
মনে রাখে না কোনো কথা।
এইমতো চ'লে যাচ্ছে, মেনে নিচ্ছে সকলেই,
যদিও, কেউ মনে রাখে না কোনো স্মৃতি।

অথচ, অরণ্য সব-ই জানে ; নদী জানে
মানুষের রক্তের জোয়ারে
ভেসে যাচ্ছে পাপ-পুণ্যি সব। অন্ধকার গলির
ইশারা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস,
পয়সার স্তূপ চকচকে।

কেউ মনে রাখে না কাউকে, সময়
কেবল মাপে আঙুলে আগুন : ছাখে,
চাল পুড়ে যেতে আরো কতো বাকী ?

কেদার ভাদুড়ী

প্রশ্ন

সম্ভাব্য আকাশ থেকে ছুটে আসে শিলা।
বেলা পড়ে এলো।
এসময়ে স্বার্থপর দৈত্য জানে ফুলের ইশারা
স্বর্গগন্ধ অর্ঘ্যপত্র ছোট্ট শিশু। খেলা

হ'লে শেষ পুনর্বার কি তুষারপাত একে একে ফিরে পেলো—
ঝঞ্ঝা ঝড় অন্ধকার শীতলতা ঘন কৃষ্ণ কুয়াশায় তারা ?

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

দেখা

আমাকে দেখছো তুমি কতোদিন থেকে
দেখছই—অবিরত দেখছই—
যেমন সমুদ্র দেখে আকাশের মুখ

তেমনি চোখের দিকে চোখ রেখে বল
কী দেখেছো কী খুঁজেছো আমার শরীরে
সব খুলে বল

আমি জানি কিছুই দেখনি
কিছুই পাওনি তুমি ঝিনুকের বুকে

কেননা আমার মুখ দেখবার নয়
কেননা আমার কষ্ট দেখাবার নয়
কেননা আমার দুঃখ জানাবার নয়
কেননা আমার মৃত্যু বোঝাবার নয়

বরং তাকিয়ে দেখো জানালার পাশে কারা যায়
ঘুরে এসো কিছুক্ষণ এসপ্ল্যানেড্ থেকে

অথবা না হয় তুমি তিস্তার বুকে বুক খুলে
অভিমানী অরণ্যের অভিযোগ শোনো
তাও যদি না পারো তো চুলগুলো খুলে বিলকুল
হাওয়ায় উড়িয়ে দিও সব প্রজাপতি

দোহাই দেখো না তুমি
আর মিথ্যে দেখতে চেয়ো না

কেননা আমার মুখ দেখবার নয়
কেননা আমার কষ্ট দেখাবার নয়
কেননা আমার দুঃখ জানাবার নয়
কেননা আমার মৃত্যু বোঝাবার নয়।

মঞ্জুভাষ মিত্র

দর্শনার শরীর

হে বৃষ্টির দেবতা এত বৃষ্টি দাও কেন, তোমার কামনামত্ত প্রচণ্ড অশ্রুপ্রহারে পৃথিবীর নদীসমূহ আর্তনাদ করে উঠল। ক্ষীণদেহা যুবতীরা দাঁড়িয়ে আছে সর্বনাশের শেষ সীমায়। কাল সারারাত তোমার বৃষ্টিধ্বনি শুনেছি, প্যারাপেটে অবিশ্রান্ত বিরামবিহীন রিমঝিম শব্দ এবং আজ দিবসের মধ্যভাগেও তার বিরাম নেই; বুদ্ধের ধ্যানের মত চিত্রার্পিতভাবে সমস্ত বিশ্ব যেন থেমে আছে। পাথরের বাঁকে বাঁকে ছুটে যাচ্ছে জল, ফুলগাছগুলি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করল এবং তারা এখন মাটির বুকে শুয়ে আছে যেন কবরখানায় উপস্থাপিত মৃতবালিকার দল। নাসপাতি গাছের ফলভরা ডালগুলি ক্লান্তভাবে দুলছে, তাদের এই ফলপ্রসবের কাল বর্ষণের তীক্ষ্ণ আঘাতে দ্যুতিময় হয়ে উঠল। পর্বতে ধ্বস নামছে, স্খলিত মৃৎখণ্ড ও প্রস্তরখণ্ড এবং বৃক্ষদেবতাদের আশ্রয়সমূহ : মৃত্যুগহ্বরে অবরুদ্ধ আত্মাসমূহের গীতশব্দ ধ্যানশব্দ শোনা যায়। গান ক'রে ক'রে এবং ধ্যান ক'রে ক'রে এতদিন মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ হে বৃষ্টির দেবতা মেঘ কুয়াশা জল ও ধূম্র আশ্রিত তোমার মহাজ্যোতির্ময় শরীর দেখে মুহূর্তের প্রবল কম্পনে আমার সম্বিৎ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে ফুলফল ও নদীসমূহ। আমি এখন কি করব বলে দাও।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

কার স্তবে

নাম না জানা কাঁটাগাছেও ফুল···

কাঁটায় জড়িয়ে ধরে জামা, অজান্তে
মৃদুগন্ধে নিজেই জড়িয়ে ফেলি, যাব কি করে,
অগৌরবেই প্রাণ গেল ভরে।

কখন যে উড়তে উড়তে এল দয়েল পাখিটা
ফুলের কাছাকাছি তার গোপন সম্ভাষণ
অতল রহস্যে বাঁধা হল সুর
এই তার অসাধ্য সাধন।

রাখালের দুষ্টু ছোট ছেলে
ছুটে এল এইখানে ঘুড়ির সন্ধানে,
হঠাৎ দাঁড়াল ফিরে সে কি জানে
দয়েলের কালজয়ী মিষ্টি সুর
গাছের আড়ালে কোন ফুলে কোনখানে।

গান গেয়ে উঠলাম হঠাৎ আমিও কান্না স্বরে
আমার আনন্দ আজ বেদনার মত
অসীম গৌরবে।

সতীন্দ্র ভৌমিক

তুমি কেমন আছ

শীত এলো কমলালেবুর রঙে
শালবন পাখিঝিল, অবশেষে
হরিণবনের গাছেদের-ভীড়ে
শরীরে ছায়া মেখে দাঁড়িয়ে ছিল
এক চকিতা হরিণী!

এইসব দেখে মনে পড়ছিল
তিস্তার চর, ডিমডিমার ব্রিজ
পাহাড়ী বনের কথা।

নীলগঞ্জের ডাকবাবুর এক
শ্যামলিমা বালিকা ছিল
চৈত্‌পূর্ণিমায় ডিহিংনদীর
বালিতে বসে বিশ্বাসের
দীপ জ্বেলে একদা সে বলেছিল :
বদলি হলেন বাবা। আমাদের
কী। আমরা তো বদলাব
না। লিখবে না চিঠি ?

দেখতে দেখতে ত্রিশটি বছর
শরীরে হারালো। আজ যায় না কি
লেখা ছল ছুতোয়,
'শ্যামলিমা,
তুমি কেমন আছ ?'

বেণু সরকার

অপসঙ্গতি

আমি যেন চাঁদেই এসে নেমেছি
পাতবো গেরস্থালী
আশে পাশে কেউ কোথাও নেই যে
আমার চিতায় দেবে একখণ্ড কাঠ
জ্বলবে আমার দেহ
সে যাক, চারজনার কাঁধে চড়াতো এখনো
অনেক অনেক দূরে
আপাতত কিছু একটা কাজ

এই যে রকম সরকারী প্রচার ব্যবস্থায়
একখানা চেয়ার
অথবা অপরাধপরায়ণতার বাবাগিরি
অথবা ছাত্রের গোয়ালে রাখালগিরি
গিরিবাদাম তো খেতে চাই না
শুধু দু'বেলা দুটো সেদ্ধ ভাত
সবার সঙ্গে থেকেও যেন মনে হচ্ছে
আমি যেন বরাবরের চাঁদেরই বাসিন্দা।

শিশির গুহ

সাইঞ্জা বেলা

[উত্তর বঙ্গের পল্লী-দেশী সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় লিখিত।]

ঝিঙা ফুল ফুটি গেল্
সাইঞ্জা বেলাতে
চ'টে বহিন পানি আইনবা
পোখর ঘাটতে
পথ্‌তে আছে কালাচান
শরমটো নাই উয়ার
ইটো কেমন মরদ মানুষি
নি জানেছে ব্যাভার
রাস্তা ছাইড়বা কহিলে উয়াক
নি শুনেছে কথা
হাসেছে ফের হামাক দেখি
শরমে খাই মাথা।

বাপোটো মোর পাথার গিছে
আইসবার হইল বেলা'
চ 'দিদি চ' চট করি চ'
কাম আছে মোর মেলা ॥১

দীপঙ্কর সেন

একা

এই প্রিয় জল ভেঙে জল ভেঙে জল ভেঙে জন্ম
না বলে কুড়িয়ে নেওয়া মাটি
চাষীর অবুঝ হাত কেটে নেয় সোনালী ফসল।

এইভাবে স্বর ভঙ্গ স্বর ভঙ্গ স্বর ভঙ্গ স্বর—
হিমস্রোতে ভেসে যাওয়া আশা
বনপথে ফিরে যায় বোঝাহীন একাকী নিষাদ।

সংকেত

ডান হাতে তালি দিলে বুঝি
কাছে ডাকছো
বাঁ হাতের শব্দে
দূরে যাওয়া
ভোর হলে
রাতের প্রতিশ্রুতি
স্বপ্ন হয়ে যায়।

মঞ্জুগোপাল দেব

কাঠ গোলাপ

বেশ কিছু কাল হলো আমি কাঠগোলাপ দেখি না
পূর্বের মতো, ফসলের ঋতুর মতো বহুক্ষণব্যাপী আমি
কাঠগোলাপের কথা ভাবি। এই ভাবে অগনন মানুষের ভীড়
সৈন্য-নিবাস, রেলের ভোঁ-এর ভেতর অন্যান্য কাঠ গোলাপেরবীজ

একদিন, সখী কাঠ গোলাপের সাথে হেঁটে যায় আমার কাঠগোলাপ

—এ'টুকুর প্রকৃত মানে চূর্ণ চূর্ণ লোহিতের মতো আহার্য আছে কিছু
এইভাবে কাঠি নেড়ে, কাঠি নেড়ে নেড়ে জলীয় বাষ্পহীন
শহর সন্ধ্যায় মান্দার বৃক্ষের সাথে কথা বলি—
তার ঝুলন্ত স্ফীতমুখী শিকড় দেখি, দেখি তার
মাংসল গোলাপ ঢেকে ফেলে ত্বরিৎ আমার কাঠগোলাপ
কিছু বইপত্র ও খরগোসের ছবিগুলা তার ঝোলা ব্যাগ।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

কবিতা : কিশোরীকে

কাকে তুমি বশ করো কিশোরী তরুণী
কার হাতে শেঁয়াকুল পাতা রেখেছিলে
ডালপালা বিষণ্ণ আকুল
ভালবাসা-ভিন্নই তাকে বশ করতে চাও ?

শিখা মজুমদার

যে পারে সে নিজেই

শিশুর কণ্ঠস্বরে ঈশ্বরের ডাক শুনতে পাই।
সব কিছু ভুলে শুধু কণ্ঠস্বর শোনা
গাঢ় চটুল, অহেতুক কণ্ঠস্বর—
ভাষাহীন, তবু সুরে ভরা
রাত্রির যেমন সুর আকাশের বুকেতে ছড়ায়—
নদীর যেমন সুর নৌকার পালে শোনা যায়—
মাঠের যে সুর শুনি আদিগন্ত নিঃসীমতায়।
শিশুর অমল স্বরে সেই সুর অবিকল বাজে।
সেই স্বরে স্নান করে সব পাপ ধুয়ে নিতে হয়
যে পারে সে নিজেই ঈশ্বর হয়ে যায়।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

দ্বিতীয় স্বর্গ

দেবরাজ এসে যদি সহসা বলেন—
'স্বর্গে যাবে?'
নির্দ্বিধায় বলে দেব—'না।

তার চেয়ে বরং ভালো
শাড়ীর ঝলক,
ভ্রূ'র বিভ্রম, আঙুলের মুদ্রা,
কোমরের অলৌকিক জোছনা,
—চোখ বুঁজে বলে দেব—
'স্বর্গে যেতে নেই'।

অরুণকুমার চক্রবর্তী

পিরথিবীটা বড়-অ বাথান, কাদ্দের

মাঠ কুড়াতে বেলা যায়, অ-মা, মা-আ-গো,……
পেটের মধ্যি বড্ড-অ আগুন
সিধা থাকতে দিলেক নাই……
রাতবিরিতে ঘুম কাইটে যায়
চাঁদ্দের শাড়ী ই-বন্ লুটায়
বন্‌বিবিটার দয়া নাই
পিয়ালপাকা ডিংলাসিজা কলমীপাতা
একটু নিমক, পাতে দে মা, আগুন জুড়াই……

পিরথিবীটা বড়-অ বাথান, হুই যেথাকে আকাশ শ্যাষ
ইত্তো বড়-অ, আর-অ বড়-অ, কিনার নাই
বড়-অ মানুষ, ছোট-অ মানুষ, সবাই কুড়ায়
অ-মা, মা আ-গো, বল্‌না কেনে
মুদের পেটে ভাত নাই…?
ই-বাথানটা কাদ্দের বটে,
মুদের লয়, তুয়ার লয়,—কারে জিগাই…?

মাঠ কুড়াতে বেলা যায়, অ-মা, মা-আ-গো…।

পঞ্চানন মালাকার

সম্ভাবনা

পৃথিবীর স্বচ্ছ ছায়া ধরে রাখা শক্তমুঠি শূন্য করতল
মেলে ধরা অনিশ্চিত অভ্যাস বশত কোন ভ্রমে।
মানুষ মানুষের ভিড়ে গা ভাসিয়ে নিজেকেই খোঁজা।

মানুষের দিনগুলি এমনি করেই কাটে নিয়ম মাফিক।
নিয়মের হেরফেরে মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে কিছু ভাঙচুর
আলোর টুকরো যেন বিচ্ছুরিত অনর্গল খণ্ডিত উল্লাস
সৃষ্টি করে অনিয়ম। বৃষ্টির ছাটের মত কুয়াশা-ধবল
সময় গড়িয়ে পড়ে অলিখিত তারতম্যে, সম্মোহিত ঘুমে।

সমস্ত মানুষের মন কেঁপে ওঠে প্রবল সংশয় কিম্বা রাগে
পৃথিবীর শক্ত বুকে মানুষের পথ-হাটা দ্রুততর হয়।
কাছাকাছি ঘন হয়ে আসা কোন প্রতিবেশী হাত
উঠে আসে করতলে। প্রবল বৃষ্টিতে হবে প্রমত্ত প্লাবন।

নির্মল বসাক

রাত্রি দেখা

আমার ঘরের জানালায় কোন পর্দা নেই
ভোর থেকে দুপুর রাত অবধি আমি আকাশ দেখি
বাতাস পাই গাছগাছালির পাতা নড়া পাখি চলা ঝড়
সবই আমার চোখের সামনে
তবু কেউ আমাকে রাত্রি দেখায় নি

তুমি শরীর জ্বালিয়ে এসে বললে রাত্রি দেখবে রাত্রি
চলো নেতার হাটে রাত্রি দেখে আসি চলো হুড্রুর ডাকবাংলোয়
নিস্তব্ধ চরাচরে চলো বাঘের ডাক শুনে আসি
ভল্লুকের ঝাপটে ধরা দেখে আসি বলে তুমি হেসে উঠলে খুব
আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো

নীল জানালায় নীল পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম
আমার ঘরে জেগে উঠলো নেভার হাট আর হুড্রর গভীর রাত

আমি রাত্রি দেখতে দেখতে রাত্রি দেখতে দেখতে রাত্রি দেখতে দেখতে
ঘুমিয়ে পড়লাম তুমি হেসে উঠলে খুব

সত্য বিশ্বাস

হীরের দানার মতো

নিতান্ত খেলার ছলে মুছে ফেলে আরব সাগর
তার কালো জলের তুলিতে কপালের সিঁদুরের টিপ।

পৃথিবীর শেষ শিলাখণ্ডের গাঢ়তর সিল্যুয়েটে
আলোকিত মন্দিরের ছবি ফুটে ওঠে।
সোমনাথ মন্দিরের কঠিন গ্রানিটে
অবিরাম রাশি রাশি তরঙ্গ ভাঙার শব্দ আর
আরতির শংখঘণ্টা ধ্বনি—
দুরন্ত ঝড়ের রাতে দুলতে থাকা অগুন্তি ঝাড় লণ্ঠনের
তুমুল শব্দের মতো বুকের গভীরে বেজে ওঠে।

পুণ্যার্থীরা নড়েচড়ে, ছোট ছোট কীট মনে হয়
উপরে নক্ষত্রময় অসীম আকাশ নিচে উত্তাল সমুদ্র
এই দুই করতলে বন্দী
পদ্মপত্রে জলবিন্দুদের রেণু রেণু অস্তিত্বের
ফুলঝুরি জ্বলা!

এ মুহূর্তে পৃথিবীর অশ্রু রক্ত ঘামা কিম্বা স্বপ্নগুলো তাই
খুবই তুচ্ছ হয়ে যায় ; তবু হাতে নিলে
হীরের দানার মতো কাছ থেকে আলো ঠিকরায় !

রমাপ্রসাদ দে

অলোক দর্শন

চোখে মুখে
বিশুদ্ধ বাতাস
মাথায়
সূর্য
আমি পথ হাঁটি।
আমাকে ক্ষমা করে না
চৈত্রদিনের দুপুর
কখনো ছাতার মতো একখণ্ড মেঘ
আমাকে ছায়া দেয় না।
শুধু কাজ আর কাজ
বড় নিষ্ঠুর এই পৃথিবী।

প্রসাধন নিপুণ কোন মহিলার মুখ
আমি ঘৃণা করি
চঞ্চল চোখ কোন রূপসীর অঞ্চল আমাকে
জড়াতে পারে না।
আমি এক প্রখর বাস্তববাদী, অতএব
আমার তাবৎ কাজে রোদ্দুর মেশাই
পথ হাঁটি ব্যস্ততায়

চলন্ত ট্রাম কিংবা ট্যাকচির মতো
আমিও একজন
থামি না থামতে জানি না।

হঠাৎ
বাবা, ও বাবা!
আমি তো অবাক
সমস্ত শহর জুড়ে
ট্রাম বাস নেই যেন আর
পদধ্বনি নেই ব্যস্ততার
ভাসে শুধু সুকোমল
আমার ছেলের মুখ
বাতাসে অস্থির ভালোবাসা!

সমীর চট্টোপাধ্যায়

রাত থাকে ঘুমের ভিতরে

রাত থাকে ঘুমের ভেতরে
মানুষ জেগে আছে দিনের আলোয়
পৃথিবীর সব সুখে দুঃখে হৃদয়ের তাপে
রাত ঢেকে রাখে কলঙ্ক, হৃদয় বিহীন অলীক শব্দের স্তূপ
সমুদ্র সৈকতের সব দুঃখ বুকে টেনে নেয়
পৃথিবীর শোকতাপ কোন নারীর স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
দিনের আলোয় মানুষের সুখ দুঃখ
মান-অভিমানে ভয়ে ওঠে বুক।
রাত থাকে ঘুমের ভেতরে নিয়ে তার গভীর অসুখ।

রাজকুমার রায়চৌধুরী

ব্যক্তিগত

প্রভু হে, তুমি ওকে ডাকো, ডাক দাও ডাকনামে
আজ বড়ো অসহায় সে
তুমি ডাকো ওকে ডাকো
মধ্যদুপুর জুড়ে জল নীতে ফিরে যাচ্ছে—
লাজুক কিশোরী বকুল।
ডাকনামে ডাকো তুমি ডাকো ওকে ডাকো প্রভু ডাকো

সংযম পাল

কবি

'শুনেছো কি আকাশের গান ?'
—যা' তোমাকে সারারাত সারাদিন
প্রবাহিত রাখে
'দেখেছো কি বাতাস-কুসুম ?'
—না' তোমাকে জেলে রাখে
আঁধার-গুহায়
'চিনেছো কি সুশীল যুবতী ?'
—যে তোমাকে ভ'রে দ্যায়
জীবনের রসে।

দুর্গা মণ্ডল

মাথুর

নদী পথে ভাসিয়ে তরণী
আমরা একাকী যাব,
সমুদ্রের স্বরবৃত্তে,
বিশুদ্ধ নদীর জল যেখানে হারাবে এক
লবঙ্গ দ্বীপের বনে। কিম্বা কোনো অনারণ্যে,
যাব নির্বাসনে।

দুয়ারে প্রস্তুত মেঘ, বারিপাতে দেবে বিসর্জন
বিচ্যুত কক্ষের পথে একটি নক্ষত্রপাত নক্ষত্রের বেগে;
অনঙ্গ পৃথিবী তুই অঙ্গে তোর কেন এত রূপ!
আবক্ষ অশ্রুতে রক্ত সমুদ্রের ঢেউ,
সুবর্ণ কাঁকন দুটি কোথায় হারালো!
কে আমারে নিয়ে যাবে অচ্ছোদ সরসী তীরে,
নীরে।

তীরস্থ গুল্মের ছায়া-কৈশোরের কেলিকুঞ্জ যত
পশ্চাতে রহিল পড়ে, সামান্যা নারীর মুগ্ধ চোখে
অসামান্য নীলপদ্মমণি;
একটি মুকুল তার স্বপ্নের দোসর,
তার পাপবিদ্ধ মুখে
সূর্যের রজতকান্তি সব থেকে যাবে;
আমরা কজন যাব মথুরার রাজগৃহে আর
অনন্ত পথের পিছে লীলাময় মধু-বৃন্দাবনে।

শান্তা চক্রবর্তী

একটা গাছ পুঁতেছিলাম

একটা গাছ পুঁতেছিলাম
বড় হবে বলে
একটা ঘর বেঁধেছিলাম
শান্তি পাব বলে
একটা মন পেতেছিলাম
কেউ বসবে বলে

সেই গাছ মরে গেল
ফলফুল কিছুই দিল না
সেই ঘর ভেঙে গেল
সান্ত্বনার আকাশ হল না
সেই মন পুড়ে গেল
কেউ ভালবেসে কাছে এল না

আমি তো তেমনি আছি
মরা গাছ ভাঙা ঘর পোড়া মন নিয়ে।

মলয় গোস্বামী

কোথায় হারালি চাবি

মা, তোর চাবির গোছা কোথায় হারিয়ে ফেলে দিলি
যে গোছা আঁচলে ঝুলতো ঝুনঝুন শব্দ হোতো পিঠে
শুলে সে-ও বালিশে শুতো, বিছানায়, শান্ত নিরিবিলি—
এখোন আঁচলে তোর ঝোলে শুধু খর কালশিটে

আলমারি, বাক্স-পেঁটরা-র সব এখোন কাহার অধীন ?
আঁচল কি ছিঁড়েছে দাঁতে, মাঠে ঘাটে, জনদরদীরা ?
বাক্স খোল, হাতে দে লিচুর মতো দিন :
প্রত্যেকে ভুলেছে তোকে ; চোখে শুধু লোভের মদিরা !

মা, তোকে পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে টানছে লোনা সাগরের
দিকে ; চোবাবে বোলে হ্যাঁচকা টানে পশুর মতো ফেলছে ধুলোয় :
কোথায় হারালি চাবি বোলে দে ! আমরা সব হা-ঘরের
ছেলেপেলে, কাপড়ে আগুন বেঁধে বাঁইবাঁই ঘোরাবো চালচুলো ॥

প্রদীপ মুন্সী

স্মৃতি—৪

সহসা জলের গভীর থেকে
উঠে আসে
কার স্বর হাওয়ায় ভেসে এসে
পাক খায় জাফরির কিনারে
ঘরদোর কেঁপে ওঠে
চৌকাঠ ভিজে যায়
চোখ জলে, চোখ বড় জ্বালা করে

স্মৃতি—৫

মর্চে-পড়া রমণী
গাভীর দেহের গন্ধ
মাটিতে নামিয়ে চোখ
লুপ্তগুহার ঘোরা

আর জলে ধোয়া সকালের সাথে
কোনো একদিন কথা বলে

স্মৃতি—৩

কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই
আবহমান মাটি
পাড়া পড়শী
খুব চেনা জানা বুক
মুখ
সরে যাচ্ছে যে যার মতন
কথা ছিল ছুঁয়ে থাকব
মাটি ভরে উঠবে ফুলে
গান গড়িয়ে যাবে
কখন আমি সরে গেছি
সরে গেছি মুখ ফিরিয়ে
বুকের ভিতর ঠাণ্ডা স্থির।

প্রদীপ মুন্সী

কবিতা

প্রতিটি কবিতা প্রথম প্রেমের
ছায়ার মতন
প্রতিটি কবিতা শূন্যের
ধ্বনির মতন
প্রতিটি কবিতা বনের একা

বৃক্ষের মতন
প্রতিটি কবিতা জলে ধোয়া একলা
প্রান্তরের মতন
প্রতিটি কবিতা একাকী বিষাদের মত
শুদ্ধ নিখাদ
প্রতিটি কবিতার আবরনে তবু সময়ের
চুন বালি
হয়ত মজ্জার গভীরে নয়।

এই সব

এই সব লেখা
এই সব লেখার ভিতরে
আমি একটিই কথা লিখতে চাই
বলা হয় না
তাই আমি লিখি, ছিঁড়ে ফেলি
ছিঁড়ি, আর লিখি
এই সব কাচে আমার মুখ
এ আমার মুখ নয়
জলের আশ্রয়ে চোখ খুলেছিল
মুখ
জল নেই, লোহা আর ইটের সমিধ
এই সব কাচে আমার এ সত্যি
মুখ নয়
এই সব খোলা দরজা
এই সব খোলা দরজা দিয়ে

আমি বাইরে যেতে পারি না
তাই আমি আমার কাছে বন্ধ একটি
দরজায় ফিরে আসি
বারবার কড়া নাড়ি
এই সব খোলা দরজা দিয়ে
আমি যেতে চাই না।

শংকর দে

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিত

মানুষের চোখের কালি জলে ধুয়ে
মুছিয়ে দিয়ে
যে-রকম হাসি ফোটে সকাল বেলায়
ভালোবাসায় বেজে যায় রাজেশ্বরীর গান
রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্যে
মেঘের সঙ্গী, কালিদাসের দূতী
সুন্দরী স্বর্গের স্বপ্নরথে ক্ষণিকের জন্য তুলনা দিয়ে চলে গেলে
ফিরেও দেখলে না
নিরভ্র পতাকায় মিছিলের উৎসব, শান্তিনিকেতনের আকাশে
ভোর হয়ে এলো অন্তনিশা, পরপারে
বৃষ্টির আনন্দে ভিজে গিয়ে সেই মেঘের রঙে নীল
পতাকা উড়িয়ে দেখি
স্বর্ণ সিংহাসনের বেদীতে বসে আছেন
কবির ঈশ্বর।
ফিরে এসে দেখি অন্ধকার কবিতার ঘরে কেউ নেই
লেখার টেবিলে

কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে যেরকম রাগ হয়
রাত দুপুরে জলের তেষ্টা পেলে শুকিয়ে যায় গলা
ফুঁপিয়ে ওঠে অভিমানে শোকে
শ্বাসকষ্ট হয় কেন ?
পথে ও হাওয়ায় বিষ, রক্তে জলে মিশে আছে খেলা
পথের ধুলোয় সাক্ষী কে ?

ঘরের মধ্যে একা আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে থাকা
সেই আয়নার দিকে
ঝাপসা হয়ে যাওয়া সেই ছবির দিকে তাকিয়ে
কী যেন বলার ছিল ?
মানুষের কথা কলমের কালি দিয়ে লেখা যায় না
বদ্ধ ও বধির যন্ত্রের শাসনে

বহিরঙ্গের অস্তিত্ব প্রয়োজনের স্বার্থকে স্বীকার করে না ?
কে বলে ? কবির সম্মানে অপুরস্কৃত
মানুষের কথার দাম ফিরিয়ে দিতে
কবিতার বাগানে
যে ফুল কথার জন্য কাঁদে
পলকের চোখের পাতায় কালো আঁখি
ভালোবেসে বলে ভালোবাসি
লোকে বলে তুমি ছদ্মবেশী
ভিক্ষুকের হাতে অন্ন দিও, জল দিও মরা মুখে
আমি চাই অমৃতের হাসি ।

প্রকৃতির নিষ্ঠুর শাসনে অভিযুক্ত মানুষের আত্মবোধ
স্বরচিত নিঃশাসনে
আমি বন্দী, তুমি অন্ধ
পাঠকের হাতে ক্ষমা করো ।

পরিমল চক্রবর্তী

কলম্বো ড্রাইভ : ১৯৭৯

এইবার সেই হ্রদে ঝাঁপ দেবো, মায়াময়ী।
(কোন্ হ্রদে ?)···ধ'রে নাও যন্ত্রণায়
হৃদয়ের চারিদিক উথালপাথাল···অন্ধকার—
গাঢ় অন্ধকার ছুঁয়েছে বুকের তট নিবিড় ক্ষুধায়।
তবু কেন বেঁচে থাকা
কল্পান্তের নিবিড় বেদনা
দেহমনে পুষে রেখে···
হয়তো বা সমস্ত জীবন জুড়ে পুষে রেখে ?
(আমিও যে ভালোবাসিতাম
যৌবনের যন্ত্রণাকে তোমারই মতন।)

মায়া, মায়াবতী, এ-কোন্ দুঃখের উপাখ্যান
আমাকে শোনালে তুমি ?
বিবর্ণ রাত্রির শেষ যাম কেন এ-ভিক্ষার লগ্ন ?
আমাদের নিঃশব্দ সাধনা
পাবে না পাবে না খুঁজে
কখনো কি কল্পান্তিক প্রমা ?
হয়তো পাবে না। তবু প্রত্যাশার হিরণ্ময় আলো
এই দুই ক্লান্ত চোখে নিভে এলে পরে
তুমি শান্ত রিক্ত মনে আরো একবার
খুঁজে নিও,
খুঁজে নিও আমার কবরে
আমার স্মৃতির শেষ স্মৃতিচিহ্ন।···

বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

তাঁর কথা

কার জন্য বিছানা ও বালিস সাজানো ?
তিনি যে বিশেষ জন—এইটা জানানো।
ব্যবহৃত তাঁর জামা জুতো চশমা ঘড়ি
এ্যাজিবিট করা আছে আর একটা ছড়ি ;
যাঁর জন্য এইসব তিনি নেই—মানে,
ইহলোক ছাড়া, তাঁর কথা—কে-না জানে !

অজয় দাশগুপ্ত

পালিয়ে যেতে চাই

পালিয়ে যেতে চাই
নিজের কাছ থেকে
এই ঘর থেকে
অন্য কোনো ঘরে

এই ঘর থেকে
এই মাটি হাওয়া গাছ
এই রোদ মেখে
যাই অন্য কোনো খানে
অন্য আলো সরোবরে

যেখানে রাগ নেই ঘৃণা নেই
হিংসা নেই নেই ভালবাসা
নেই কোনো স্বার্থপর ভাষা

সে আমার আপনার ঘর
সে আমার অভিষ্ট ঈশ্বর
তাকে ফিরে পেতে চাই…
পালিয়ে যেতে চাই।

রবীন সুর

বাবাকে

আমি তোমার মত হইনি।
শুধু
তোমার সমস্ত দোষ শ্মশানে পুড়িয়ে
ছাই ঘেঁটে
যেটুকু খাঁটি
তুলে এনে রক্তে মিশিয়েছি ;
এ ভাবেই এক জীবনে দুবার জন্ম।

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বৎসরান্তে

হে ব্রহ্মর্ষি, শোন তবে ভোজের খবর !
কাল রাতে লাখটাকার লাঞ্চে
ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর ছিলেন সেই সব পার্শ্বচর
যারা কথা তৈরী করে বিধান গড়ে
কিম্বা হালিমখাঁর কথার কাগজে !

কিন্তু কি সুন্দর রাত
ইতিহাস কথা কয় কথা কয় সেই পাঙ্কালির শরীর
কিম্বা সেই বাণ্ডিল—
তবু সেই বয়েস
কি নিশ্চিন্তে ঘেটে চলে পুরীশ আর ক্লেদ
যদি এই মুহূর্তে সংবাদ ওঠে
পুড়ে গ্যাছে লেবানন কিম্বা পোল্যাণ্ড শহর
কি হয় কি হয়

পাখী উড়ে যাবে
উড়ে যাবে কাক আর শালিক
থাকবে কালের লেখন—

আছে সর্ষপ আর পালিশ করা নগর
আর থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী আর তার সেই সব পার্শ্বচর !

'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন'

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

কবিতা শব্দের সংসার না ভাবের সংসার এই প্রশ্ন মাইকেল তুলিয়াছিলেন। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া তিনি লিখিলেন যে কেহ কেহ বলেন 'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন' তিনিই কবি। কিন্তু তিনি যেন কথাটি মানিয়া লইতে পারিলেন না। তাঁহার মতে কাব্য কি না তাহা 'ভাবের সংসারে' 'সুবর্ণ-কিরণ।' এই সুবর্ণ-কিরণ কল্পনা-সুন্দরীর সৃষ্টি। এই কল্পনাসুন্দরীকেই তিনি "মেঘনাথবধ-কাব্যে"র প্রারম্ভে "মধুকরী কল্পনা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু "মেঘনাথবধকাব্যে"র প্রথম বন্দনা 'অমৃতভাষিণী' বাগ্‌দেবীর বন্দনা। আর কবি হিসাবে মাইকেলের সকল চিন্তা-ভাবনাই ত দেখি এই ভাষা লইয়া। তাঁহার মাতৃ-ভাষা শব্দের 'খনি।' কাশীরাম দাস 'ভাষা-পথ খননি স্ববলে' মহাভারতের রস বাঙালির কাছে পৌঁছাইয়া দিয়েছেন। জয়দেবের ধ্বনি 'মধুর ধ্বনি'। বাংলা ভাষা সুন্দরী জননীর সুন্দরতর দুহিতা। সংস্কৃত 'সাগর-কল্লোল-ধ্বনি।' মাইকেল এই 'সাগর-কল্লোল-ধ্বনি' বাংলা ভাষায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। এক আধুনিক ভাষায় প্রাচীন ভাষার এই ধ্বনি তিনি শুনিলেন মিলটনের "প্যারাডাইস লষ্ট" কাব্যে।

মাইকেলের "মেঘনাদবধকাব্য" সাধারণ বাঙালি পাঠকের এক সাধের কাব্য এমন কথা বলিতে পারি না। উপন্যাস-ভোজী, বাঙালি যখন কবিতা পড়িতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি 'মেঘনাদবধকাব্য' পড়েন না। "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র কোন অংশ কোন কীর্তনীয়ার কণ্ঠে শুনি নাই। মাইকেল আমাদের সাহিত্যে সনেটের স্রষ্টা; তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ সনেট রচয়িতা নন। তাঁহার কোন নাটক এখন আর বড় অভিনীত হয় না। তাহা হইলে তিনি কোন গুণে 'হেন অমরতা' লাভ করিলেন। যদি বল তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব "মেঘনাথবধকাব্যে"র অমিত্রাক্ষর ছন্দে আর কয়খানি বাংলা কাব্য রচিত হইয়াছে? মাইকেল কোন বাঙালি কবির গুরু? বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতাকে তাহা হইলে মহাকবি বলিব কোন অর্থে?

সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রে যিনি প্রথম তাহাকে কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিহ্নিত করি না। ইংরাজিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম কবি সারে—কিন্তু সারে এক নগণ্য কবি। মিলটন ইংরাজি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক নন, কিন্তু মিলটন এক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি। মাইকেলের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ?

মাইকেলের শ্রেষ্ঠত্ব বাংলাভাষার এক অশ্রুতপূর্ব ধ্বনির আবিষ্কারে। এ ধ্বনি চর্যাপদে শুনি নাই, বৈষ্ণবপদাবলীতে শুনি নাই, মঙ্গলকাব্যে শুনি নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত দুই প্রাচীন মহাকাব্যের বঙ্গীয় সংস্করণ। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষাকে মহাকাব্যের ভাষা কে বলিবে ?

চপল বানর জাতি চপল তোর মতি।
চপল হৈয়া না জান ধর্মের কি গতি ॥

কাশীদাসের বংলা আরও প্রায় দুইশত বৎসর পরের বাংলা। কিন্তু সেই বাংলায় ধ্বনির ঐশ্বর্য কই ?

বাহন ভূষণ মোর কোন প্রয়োজন।
আমি লই যাহা নাহি লয় অন্যজন ॥

আর যে বৈষ্ণবপদাবলী শব্দ-মাধুর্যে অদ্বিতীয় তাহাতেই বা সাগরের কল্লোল বা মেঘের মন্দ্র কোথায়। এই দুই এর মিশ্রণকেই ত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন 'দ্য সার্জ এ্যাণ্ড থাণ্ডার অব দ্য অডিসি'। জ্ঞানদাসের 'মেঘ-যামিনী অতিঘন আঁধিয়ার। / ঐছে সময় ধনী করু অভিসার ॥' বাংলা ভাষার এক নূতন রূপের সন্ধান দিল। সে রূপে লিরিকের মাধুর্য আছে, মহাকাব্যের মহত্ত্ব নাই। আর মাইকেলের পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের ভাষা সুষ্ঠু, সে ভাষায় ওজোগুণের অভাব।

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥

ইহাতে রাম শ্যাম যদু মধুর ভাষায় এক পরিচ্ছন্ন মার্জিত রূপ। দেব দানব সিদ্ধ গন্ধর্বের ভাষার ধ্বনি-মাহাত্ম্য হইতে পাইলাম কই।

মাইকেল তাহা হইলে কোন বাঙালি কবির ভাষাকে তাঁহার মডেল বলিয়া গ্রহণ করিলেন ? এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি হিসাবে মাইকেলের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে তিনি কোন বাঙালি কবির ভাষাকে আদর্শ ভাষা বলিয়া মানিয়া লন নাই।

যে ধ্বনি তিনি কোনো বাঙালি কবির কণ্ঠে শুনেন নাই তিনি সেই ধ্বনি বাংলা শব্দ দিয়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। বাংলা কাব্যে তাঁহার ষ্টাইল অনন্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কারের চাইতেও এই আবিষ্কার এক মহৎ কীর্তি। বলিতে পারি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই নূতন ধ্বনির এক অপরিহার্য আধার।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" অথবা "মেঘনাদবধকাব্যে"র ধ্বনি যদি মাইকেল কোন বাঙালি কবির কণ্ঠে শুনিয়া না থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহা কোন কবির কণ্ঠে শুনিয়াছেন। এই প্রশ্ন মিলটন সম্বন্ধেও উঠিতে পারে। "প্যারাডাইস লষ্টে"র ধ্বনি মিলটনের পূর্বে ইংরাজি কাব্যে শুনিনা— এমনকি দুই শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবির কাব্যেও তাহার আভাস মাত্র পাই না। সে ধ্বনি স্পেন্সারে শুনি না, শেক্সপিয়ারে শুনি না। তাহা হইলে "প্যারাডাইস লষ্টে"র উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি কোথা হইতে আসিল। যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠস্বর তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বর; তাহা অন্য কোন কবির কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। তবু দেখি পৃথিবীর কাব্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট কবির ষ্টাইল আর এক বিশিষ্ট কবির ষ্টাইলকে মনে করাইয়া দেয়। ভার্জিলের "ঈনিড" পড়িয়া ভাবি হোমারের "ইলিয়াড" যদি রচিত না হইত, তাহা হইলে "ঈনিড" পাইতাম না। আবার "প্যারাডাইস লষ্ট" পড়িয়া ভাবি এই কাব্য হোমার-ভার্জিল-পড়া কবির সৃষ্টি। মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্য" সংস্কৃত, গ্রীক এবং ল্যাটিন মহাকাব্য-পড়া কবির সৃষ্টি। এই কাব্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গীত, হোমারের গাম্ভীর্য আর ভার্জিলের কোমলতা একত্র হইয়া এক অপূর্ব ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে। মাইকেল ভাষার এই ভিন্নগুণের সমন্বয় দেখিয়াছিলেন মিলটনের "প্যারাডাইস লষ্ট" কাব্যে। ধ্বনি মাহাত্ম্যে "মেঘনাদবধকাব্য" বাংলাভাষার "প্যারাডাইস লষ্ট"।

ভাবের দিক হইতেও দেখি এক অর্থে এই বাংলা কাব্যখানি "প্যারাডাইস লষ্টে"র সগোত্র। মিলটনের গভীর জীবন-দর্শন মাইকেলের ছিল না। মিলটনের সৃষ্টিকর্মে কাব্য-সাধনা ও জীবন-সাধনার যে নিবিড় যোগ তাহাও মাইকেলে দেখি না। কিন্তু "মেঘনাদবধকাব্য" খানি মাইকেলের জীবনের "প্যারাডাইস লষ্ট"। উভয় কাব্যই তাহাদের স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজিক ব্যর্থতার এক মহৎ উচ্চারণ। "মেঘনাদবধকাব্য" খানি 'আত্মবিলাপ' নামক লিরিকটির

এক এপিক বিস্তার। ইহার বীর রস গৌণ, করুণ রস মুখ্য। এই দুই রসের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাণবস্তু তাহা কে বলিয়া দিবে? মাইকেল বীর-রসকে বলিলেন 'রস-কুল-পতি' আর করুণ রসকে বললেন 'রস-কুলে-রাণী'। রামায়ণ মহাভারতে, ওডিসিতে ঈপিডে এই দুই রস যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার। "মেঘনাদবধ কাব্যে"র শেষ কথা :

'সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'

'আত্মবিলাপ' কবিতাটির করুণ জিজ্ঞাসা 'কবে পোহাইবে রাতি।'

ফরাসী কবি মালার্মে তার বন্ধু দেগাকে একদিন বলিয়া বলিলেন : 'কবিতার উপজীব্য চিন্তা নহে, শব্দ।' এই কথাটি লইয়া কূট তর্ক বিতর্ক বড় কম হয় নাই। আমরা সাধারণ পাঠক কবিতার শব্দ শুনিয়াই মুগ্ধ হই, উৎকর্ণ হইয়া সেই শব্দ শুনি। তাহার পর সেই শব্দ কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌছায়। কিন্তু সেই শব্দ অর্থের মধ্যে মিলাইয়া যায় না। সেই শব্দের সঙ্গীত যেন তখন আমাদের দেহ ও মনে সঞ্চারিত হইয়া আমাদের নূতন লোকে লইয়া যায়। ভাবলোকের এই নূতনত্ব ভাষার নূতনত্ব। শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় তাঁহার ভাষা এক নবজন্ম লাভ করে। মাইকেলের কাব্যে বাংলা ভাষা এক নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, এক নূতন শক্তি অর্জন করিয়াছে। চীনা বাজারের এক দোকানদার "মেঘনাদবধকাব্য" পড়িতেছে দেখিয়া মাইকেল বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই দোকানদারটিও কিন্তু "মেঘনাদবধকাব্যে"র ভাষার সমারোহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাঙালির সে বিস্ময় আজিও ফুরায় নাই। যে যুগে দাসরথি রায়ের পাঁচালি আদৃত সেই যুগের কবি পুত্রশোকাতুর রাবণ সম্বন্ধে লিখিলেন :

—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে,—

'দিন দিন হীন বীর্য' রাবণের বর্ণনায় তৎসম শব্দের ঘটা দেখিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন এই চরণটি বাংলা না সংস্কৃত? বঙ্কিমের 'একদিন প্রয়াগ-তীর্থে, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট দিগন্ত-শোভা প্রকটিত হইতেছিল' পংক্তিটি পড়িয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ইহা বাংলা না সংস্কৃত। রবীন্দ্রনাথের—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব-হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবন বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।"

পড়িয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ইহা বাংলা না সংস্কৃত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশির সন্ধ্যায় প্রচারিল আচম্বিতে অথবার অহেতু আকুতি। বাংলা না সংস্কৃত? বিষ্ণু দে বলেন 'গ্রামে ও সহরে পাবে কবিতার ভাষা।' কিন্তু বিষ্ণুবাবুর

'উষসী উষায়, সবিতার খড়্গে, খড়্গে,
যে সবিতা পশ্চাৎ ও যে সবিতা পুরস্তাৎ'

এই লাইন দুইটি পড়িয়াও জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ইহা বাংলা না সংস্কৃত। দেখিতেছি একালের কাব্যেও দুহিতার কণ্ঠের সঙ্গে জননীর কণ্ঠ কখনও কখনও মিলিয়া যাইতেছে। কাহার কণ্ঠ কত মধুর, তাহা পাঠক বিচার করেন। তবে "মেঘনাদবধ কাব্যে"র ভাষায় এখন আর কোন কাব্য লিখিত হয় না—মনে হয় ভবিষ্যতে হইবেও না। "মেঘনাদবধ কাব্যে" দেব-দেবীর ভাষা, দানব-দানবীর ভাষা, অতিদূর এক পৌরাণিক জগতের ভাষা। পৃথিবীর কোন আধুনিক কাব্যে পুরাণ-কথার জগৎ এমন জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। ইহার আকাশ যেন অন্য আকাশ, ইহার সমুদ্র যেন অন্য সমুদ্র, ইহার নদনদী পর্বত সব কিছুই যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের বস্তু। ইহার চরিত্রগুলিও যেন এক বিস্মৃত যুগের অতল গর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের দেবলোক, নরলোক, রাক্ষসলোক আমাদের পরিচিত জগৎসংসারের মতই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে নাকি সভ্যতার অহি-নকুল সম্পর্ক। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত এই বাংলা মহাকাব্যখানি এই হিসাবে পৃথিবীর আধুনিক সাহিত্যে এক বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু পৃথিবী এই বস্তুর সংবাদ রাখিল কই। কোনদিন রাখিবে বলিয়াও মনে হয় না। "মেঘনাদবধ কাব্যে"র শ্রেষ্ঠত্ব তাহার ভাষায় আর সে ভাষার সার্থক অনুবাদ বোধ হয় অসম্ভব। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি ঈনিড যে কোন ভাষায় সরল গদ্যও ক্লাসিক হিসাবে গণ্য হইবে। ইহাদের কাহিনী শুনিবার

মত কাহিনী। "মেঘনাদবধ কাব্যে"র কাহিনী মাইকেলের মুখে না শুনিলে আর শুনিয়া বড় লাভ নাই। একজন ইংরাজ মাইকেল বা একজন ফরাসী মাইকেলও একখানি ইংরাজি বা ফরাসী মেঘনাদবধ কাব্য উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ঐ ভাষায় বা কোন ভাষায় আজ আর একজন মাইকেল খুঁজিয়া পাইবে না।

উঠিলা রাক্ষস পতি প্রাসাদ-শিখরে
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

একালের কোন কবি এই ভাষায় আর লিখিবেন না। কিন্তু বাংলা ভাষায়ও এই কনক উয়দাচল তুল্য প্রাসাদশিখর আর এই অংশুমালী দিনমণি এই একখানি কাব্যেই দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। ইহার কবি আধুনিক সাহিত্যে অনন্য বলিয়াই যেন বড় নিঃসঙ্গ। কিন্তু এই কবিই শতাধিক বর্ষ পূর্বে বাংলা ভাষার অনন্ত সম্ভাবনার সন্ধান দিয়াছিলেন। এবং এই হিসাবে মাইকেল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক। এ কথা সেকালের বাংলা গদ্যের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। তিনি বাঙালিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন"।

ভারতীয় সঙ্গীত মূর্ছনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাক্-বৈদিক স্বরূপটুকু আজও আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়। ইতিবৃত্তকারগণ বহু পরিশ্রম করেও তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন নি, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া। এই অনুমানের সারকথা হল, প্রাক্‌বৈদিক যুগের মানবগোষ্ঠী সঙ্গীতকে প্রয়োগ করত নানা উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে। আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীনতম সভ্যদেশ-গুলির প্রাগ-ঐতিহাসিক সঙ্গীতের স্বরূপ ও চরিত্র মোটামুটি অভিন্ন। মনুষ্য-সমাজের ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ ও চিন্তাশীল ক্রমবিকাশ যতই প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল, সঙ্গীতও তত বহির্মুখী চরিত্র ত্যাগ অন্তর্মুখীন হতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুবাদে একদেশের মানুষ অপর দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করল। আত্মীকরণ অথবা আত্মসাৎ-এর মাধ্যমে সকল দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পুষ্ট হতে লাগল। রাজতন্ত্র সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত অভিজাত ও গ্রাম্য এই দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়। পৃথিবীর যে-কোন দেশের সাঙ্গীতিক বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে এই দুটি মূল স্রোতকে বহু শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। পরবর্তী স্তরে অভিজাত সঙ্গীত দুটি শাখায় পুনর্বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ধর্মীয় সঙ্গীতের সংজ্ঞায় বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়ে বহু শত বছর ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। অপরটি ধর্ম-নিরপেক্ষ সঙ্গীতের রূপ লাভ করে অতিক্রুত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। যার একটি উপশাখা তার স্বকীয়তা বর্জন করে লঘু সঙ্গীত অথবা রঙ্গীন গানে বিলীন হয়ে যায়।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিবর্তনের ইতিবৃত্তে এই ধারাবাহিকতার খুব একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবু একটা সূক্ষ্ম-ব্যতিক্রম যা গবেষকদের দৃষ্টি এড়ায়নি, তা হল ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সঙ্গীতের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য এবং পৃথিবীর যে-কোন দেশের তুলনায় ভারতীয় ধর্মীয় সঙ্গীতের ওপর অধিকতর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল হিসেবে আমরা লাভ করি গান্ধর্ব সঙ্গীত যার সমকক্ষ সঙ্গীত-বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন

দেশেই সৃষ্টি হয় নি। যার স্বরূপ উপলব্ধি করলে তবেই ভারতীয় সঙ্গীতের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। যে সঙ্গীত-বিজ্ঞান ভারতের মাটিতে এমন একটা সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল যখন প্রায় পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্য দেশের সঙ্গীত ছিল আদিম সঙ্গীতের স্তরে।

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক বিবর্তন আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এ সময় থেকেই দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় সঙ্গীতের দুটি মূল স্রোত, বৈদিক ও লৌকিক, ভারতীয় জনগণের কাছে সমভাবে সম্মানিত ও আদরণীয়। এই সময়কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে-তিন তিন থেকে চার হাজার বছরের কম নয়। বৈদিক সঙ্গীতের স্রষ্টাগণ হলেন বৈদিক আর্য বা 'নর্ডিক' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানবগোষ্ঠী যাঁরা 'বেদ' গ্রন্থে নিজেদের 'দেব' বা 'দেবতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর দিকে লৌকিক সঙ্গীতের নবরূপের স্রষ্টা হলেন 'রুদ্র'-জাতির জনৈক নেতা, যিনি আমাদের কাছে শিব নামে প্রসিদ্ধ ও পুজিত এবং যিনি প্রাচীন লৌকিক সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতম গুণী। যাঁরা খুঁটিয়ে 'বেদ' পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই 'রুদ্র' জাতি এবং তাঁদের নেতা 'শিব' সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। এখানে উল্লেখ্য 'বেদ' গ্রন্থে 'দেব' জাতি এবং তাঁদের নেতা ইন্দ্রকে বহুগুণে ভূষিত করলেও কখনোই সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীত পারদর্শী হিসেবে 'দেব' জাতিদের উল্লেখ করা হয় নি, যা করা হয়েছে গান্ধর্ব ও রুদ্র জাতির বেলায়। নৃতাত্ত্বিকগণ 'দেব' বা নর্ডিক শাখার নরগোষ্ঠীর সঙ্গে গান্ধর্ব ও রুদ্র জাতির মানবগোষ্ঠীকে অভিন্ন মনে করেন না। প্রকৃত অর্থে প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রগণ খুব সহজেই গান্ধর্ব ও রুদ্র জাতিদের বৈদিক আর্য অপেক্ষা প্রাচীনতর বলে প্রমাণ করতে পারেন। এর জন্য ইউরোপীয় গ্রন্থের সাহায্য লাগে না।. এত কথা বলার উদ্দেশ্য, প্রাক্‌বৈদিক যুগে ভারতীয় লৌকিক সঙ্গীতের ধারাটির দুটি উন্নত পর্যায় ছিল। একটি গান্ধর্বদের দ্বারা বিবর্তিত অপরটি রুদ্রদের দ্বারা।

বৈদিক সঙ্গীতও দুটি প্রধান শৈলীতে বিভক্ত হয়, একটির নাম 'সামগান' অপরটির নাম 'গ্রামগেয়' গান। যদিচ নাম ও প্রয়োগ ভেদে বৈদিক সঙ্গীত গ্রামগেয়, উহ, উহ্য, অরণ্যগেয় ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে গ্রামগেয় গানে আদিম সঙ্গীতের স্পর্শ ও কিছু বৈদিক আদিম নাট্যরূপের উপাদান আছে।

আধুনিক কালের অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত হল, ভারতীয় লৌকিক সঙ্গীতের ঐতিহ্য বৈদিক সঙ্গীত অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং এই সঙ্গীতের প্রভাবেই বৈদিক স্বর-সপ্তক পূর্ণতা লাভ করে।

পরবর্তীকালে ব্রহ্মা নামক জনৈক বৈদিক গুণী বৈদিক সঙ্গীতকে প্রাচীন গান্ধর্ব সঙ্গীতের এবং আংশিকভাবে লৌকিক সঙ্গীতের উপচারে সাজিয়ে সৃষ্টি করলেন নবরূপী গান্ধর্ব সঙ্গীত। বৈদিক সঙ্গীতের কিয়দংশ গান্ধর্ব সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে গেলেও, তার মূল ধারাটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশীলিত হত এবং শীর্ণকায় জলধারার মত গ্রীক-আক্রমণের পূর্বকাল পর্যন্ত বেঁচেছিল। বৈদিক গুণীগণ 'শিক্ষা' গ্রন্থগুলির মাধ্যমেও তাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় শতকের চার-পাঁচশো বছর আগে থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রবল জোয়ার গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। বৌদ্ধরা ছিলেন সর্ব বিষয়ে লৌকিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং একারণেও বৈদিক সঙ্গীতের অনুশীলন ও প্রসার অনেকখানি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ব্রহ্মার পর গন্ধর্ব-সঙ্গীতগুণীগণ স্বর নিয়ে নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফলে জন্ম নিল গ্রাম, শ্রুতি, মূর্ছনা, সম্বাদ-অনুবাদ-বিবাদ, লোপ-বিধি, অল্পত্ব, বহুত্ব, শ্রুতি-জাতি, স্বর-শ্রুতি ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ। গন্ধর্ব গুণীগণ ভারতীয় সঙ্গীতকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছিলেন যা আজও আমাদের বিস্ময়-উদ্রেক করে।

বৈদিকোত্তর মহাকাব্যের যুগে (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) আমরা দেখেছি ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সময়ে সাতটি শুদ্ধ স্বর নিয়ে সাতটি শুদ্ধ জাতির জন্ম হয়। পরবর্তীকালে এর থেকে আরো এগারোটি বিকৃতি জাতি সৃষ্টি হয়ে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী—খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যে) সময়কাল পর্যন্ত মোট আঠারোটি জাতি বা জাতিরাগ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন নাট্যবেদ রচয়িতা দ্রুহিণ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৮ম শতাব্দী) এই জাতিগুলিকে অবলম্বন করে নাট্যের উপযোগী করে যে নতুন গীতিধারা তৎকালে প্রচলন করেন তাকে বলা হয় মার্গসঙ্গীত। মার্গসঙ্গীত কেবল প্রাচীন নাট্যে ব্যবহৃত ছিল, মার্গসঙ্গীতে একদিকে যেমন গান্ধর্বসঙ্গীতের উপাদান ছিল প্রচুর, তেমনি ছিল কিছু বৈদিক নাট্যের উপাদান। যাইহোক ভরতোত্তর-

কালে মার্গসঙ্গীত কিন্তু দ্রুত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। এই অবলুপ্তির আপাত-মুখ্য কারণ দুটি। এক, সদাশিব প্রবর্তিত প্রাচীন লৌকিক নাট্যরীতির জনপ্রিয়তা যা দ্রুহিণ প্রবর্তিত এবং ভরত-প্রচারিত নাট্যধারাকে ম্লান করে দেয়। দুই, গ্রীক আক্রমণের পর গান্ধর্ব সঙ্গীত ও নাট্যে যে যাবনিক প্রভাব পড়ে তাতে গান্ধর্ব সঙ্গীত তার স্বকীয়তাকে হারিয়ে ফেলে। যদিচ তার বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি পরবর্তী বহু শতাব্দী ব্যাপী প্রযুক্ত হতে থাকে।

খ্রীষ্টীয় শতকের প্রায় শুরু থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে আরেকটি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা চোখে পড়ে। এই সময়ে আঞ্চলিক জনপ্রিয় সুর (অথবা ধুন)-গুলিকে পরিশ্রুত করে সেগুলিকে শাস্ত্রীয় 'রাগ' পদবাচ্য করা হয়। অবশ্য এর পূর্বেও এই রকম প্রচেষ্টা যে কিছু হয় নি তা নয়। তবে তাকে ক্ষীণ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। গোঁড়া শাস্ত্রকারদের অনুশাসনে সেই প্রচেষ্টা খুব একটা ফলবতী হয় নি। সে কারণেই প্রাক-ভরতকালে মাত্র দু-একটি দেশাখ্য শ্রেণীর গ্রামরাগের উল্লেখ পাই। যাইহোক বৃহদ্দেশী (খৃঃ ৫ম-৭ম শতাব্দী) গ্রন্থে দেশী রাগের তালিকা দেখেই ভরতোত্তরকালে শুদ্ধিযজ্ঞের ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

জাতি বা জাতিরাগ সৃষ্টির প্রায় হাজার বছর পর (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী) গ্রামরাগ, উপরাগ ইত্যাদি জাতিগুলি থেকে সৃষ্টি হয়। এরও বেশ কিছু পরে ভাষারাগ, রাগ ইত্যাদিগুলি উদ্ভূত হয়। সে কারণে আজও কোন গবেষককে প্রাচীন কোন রাগের স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে, মূর্ছনার সাহায্যে সর্বপ্রথম সেই জাতির শুদ্ধরূপ নির্ণয় করতে হবে, যার থেকে বিবর্তিত হয়ে ঐ রাগটি সৃষ্টি হয়েছে। ভরতোত্তর কাল থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সাঙ্গীতিক ধারা আসমুদ্র-হিমাচল আচ্ছাদিত করে রেখেছিল সঙ্গীত ইতিবৃত্তে তা অভিজাত দেশী সঙ্গীত নামে আখ্যায়িত। এবং আজও ভারতবর্ষে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নামে যা প্রচলিত তা এই অভিজাত দেশী সঙ্গীতেরই বিবর্তিত রূপ, মার্গ সঙ্গীত নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ওপর সর্বাপেক্ষা চরম আঘাত আসে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী মুসলিমদের এদেশে স্থায়ীভাবে রাজত্ব করার পর থেকে। হিসেব করলে দেখা যাবে সুলতানী ও মুঘল রাজত্বে আমরা

পেয়েছি যা, হারিয়েছি তার চেয়ে বেশী। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র যা গান্ধর্ব-বিদ্যা নামে প্রচলিত তার দ্রুত অবলুপ্তি ঘটতে শুরু করে এই সময় থেকেই। মুসলমান সঙ্গীতগুণীদের কৃপায় নতুন সঙ্গীতশাস্ত্র তৈরী হয় প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতকে ব্যাখ্যা করার জন্য। একে আমরা চলতি কথায় ঠাটবাদ বলে থাকি। এই ঠাটবাদ সর্বতোভাবে অবৈজ্ঞানিক, অন্ততঃ সনাতনী হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাখার ব্যাপারে। সবচেয়ে মজার কথা হল, আজও এই ঠাটবাদ—হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী সঙ্গীতের শাস্ত্র হিসেবে মানা হয়। এবং অধিকাংশ আধুনিক সঙ্গীতগুণী প্রচারের চাপে এই ঠাটবাদকে মেনে নিয়েছেন। ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁর গানে হারমোনিয়ামের প্রয়োগ নিষেধ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রাম-শ্রুতি-মূর্ছনায় পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে তা উপলব্ধি করা যাবে না। যদিচ রবীন্দ্রনাথের হারমোনিয়ামের প্রতি বীতস্পৃহতা সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগীদের অনেকে অনেক কথা বলেছেন ও লিখেছেন যার অধিকাংশই বক্তা বা লেখকের আন্দাজ অথবা স্বকপোলকল্পিত তত্ত্ব। যাতে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় মেলে না।

যাইহোক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল থেকেই বিদেশী মুসলিম সঙ্গীতগুণীগণ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি দারুণ ভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতকে শেখার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কোন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রী বা সঙ্গীতগুণী সামান্য অর্থের প্রলোভনে ভারতীয় সঙ্গীতের রহস্যের চাবিকাঠি সেইসব বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন যারা একদিন (এবং তখনও) তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় বিদেশী সঙ্গীতগুণীগণ তাঁদের দেশীয় স্বরসপ্তক দিয়ে, যা শুদ্ধ-কোমল-কড়ি ইত্যাদি রূপ-সমন্বিত, ভারতীয় সঙ্গীতকে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। এই স্বরসপ্তক পারসিক-সপ্তক নামে সমধিক প্রচলিত। যাতে শুদ্ধ-কোমল ও কড়ি মিলিয়ে দ্বাদশটি বা বারোটি স্বর থাকত। ভারতীয় প্রাচীন সপ্তক থেকে মধ্যযুগীয় পারসিক সপ্তকের প্রভেদ অনেক। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতে ৭টি শুদ্ধ স্বর ছাড়াও চ্যুত, সাধারণ, অন্তর, কাকলী ও কৈশিক ইত্যাদি বিকৃত স্বরসমূহ ছিল যা নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি দ্বারা চিহ্নিত। যার সঠিক প্রয়োগে রাগ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতাব্দী থেকে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ব্যাখ্যাকল্পে যে নতুন সঙ্গীত-শাস্ত্র সৃষ্টি হয় তাকে বলে ঠাটবাদ। এই ঠাটবাদে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন সপ্তস্বর ও দ্বাদশ-স্বর মূর্ছনার নামানুকরণে পারসিক ১২টি স্বর (শুদ্ধ, কোমল ও কড়ি যুক্ত) থেকে এক-একবারে ৭টি স্বরের ক্রম নিয়ে নতুন মূর্ছনা সৃষ্টি করা হয়, যার মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় রাগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আধুনিককালে বহু সঙ্গীতশাস্ত্রী একে ভুলক্রমে মধ্যযুগীয় দ্বাদশ-স্বর মূর্ছনা নামে অভিহিত করেছেন। এই পদ্ধতিতে কোন মূর্ছনায় একই স্বরের শুদ্ধ ও কোমল রূপ পাশাপাশি ব্যবহৃত হত না। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতীয় সঙ্গীতোপজীবিগণ এই ১২টি স্বর থেকে ৭টি শুদ্ধ ও ৭টি বিকৃত মূর্ছনা সৃষ্টি করেন। ঠাটবাদীগণ মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের অবলুপ্তি ঘটিয়ে, শুধুমাত্র ষড়্জ-গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখলেন এবং এই গ্রামে একই নামে ৭টি শুদ্ধ মূর্ছনা ও ৭টি বিকৃত মূর্ছনার প্রচার করলেন। মূর্ছনার নামগুলি কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত থেকে ধার করা হয়েছিল এবং সেগুলি সবই ষড়্জগ্রামীণ মূর্ছনার নাম। ঠাটবাদীগণ গ্রামভেদ মানেন না, অথচ তানপুরার ব্যবহারকে নিশ্চিতভাবে রেখে দিলেন যা একান্তভাবে গ্রামনির্দেশক যন্ত্র। তাঁরা এক সপ্তকে ২২ শ্রুতি মানলেন। কিন্তু সপ্তক ও রাগে শ্রুতির প্রয়োগ স্বীকার করলেন না। মুসলিম যুগে সুলতান ও বাদশাহদের ব্যাপক সহযোগিতার ফলে ঠাটবাদ ভারতীয় সঙ্গীতের শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত হতে লাগল এবং আজও তাই রয়েছে। প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্র কেবলমাত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরায় খুবই স্বল্প-সংখ্যক সঙ্গীতগুণীর মধ্যে বেঁচে রইল। ঠাটবাদ কোনক্রমেই ভারতীয় সঙ্গীতকে ব্যাখ্যা করতে পারে না বলেই ভারতীয় সঙ্গীত ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় (ঠাটবাদ) দুটি পৃথক বিপরীত ধারায় প্রবহমান হল এবং আজও সেই ধারা অক্ষুন্ন রয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীত প্রকৃত সঙ্গীতগুরুর কণ্ঠে ও যন্ত্রে ফল্গুধারার মত আজও তা প্রবাহিত যা কেবল প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। মধ্যযুগ থেকেই ভারতীয় সঙ্গীত পুরোপুরি শাস্ত্রজ্ঞান-বিবর্জিত কিছু আতাঈ শ্রেণীর সঙ্গীতোপজীবি গুরুর দখলে চলে গেল। গায়ক হতে লাগল সম্মানিত। নায়ক চলে গেল যবনিকার অন্তরালে।

তবু মধ্যপন্থী একদল মেলবাদী সঙ্গীতগুণী ভারতীয় সঙ্গীতের বিজয়

পতাকাকে ঠাটবাদীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজ-আনুকূল্য লাভ না করায় সে চেষ্টা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে দক্ষিণী গুণী মাধবাচার্য বিদ্যারণ্য নামক জনৈক সঙ্গীতগুণী তৎকালে প্রচলিত ১৫টি বিশিষ্ট রাগ থেকে ১৫টি মেল সৃষ্টি করলেন। অন্যান্য রাগগুলিকে এই ১৫টি রাগের সঙ্গে মিল রেখে বর্গীকরণ করলেন। তাঁর এই পদ্ধতি উত্তর-ভারতের সঙ্গীতগুণীগণ আংশিকভাবে মানলেও দক্ষিণী সঙ্গীতগণ অধিকাংশই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দক্ষিণভারত কিন্তু শুরু থেকেই ঠাটবাদকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ অধিকাংশ হিন্দু সঙ্গীতগুণী মুসলিম অত্যাচার ও ধ্বংসলীলার হাত থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য সে-সময়ে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা রাজ-সমর্থনপুষ্ট ঠাটবাদী মুসলিম সঙ্গীতগুণী ও ধর্মান্তরিত (হিন্দু থেকে) সঙ্গীতোপজীবিদের সঙ্গে প্রচারের অভাবে এঁটে উঠতে পারছিলেন না। সুতরাং তাঁরা বাঁচার তাগিদে মাধবাচার্যের মেলবাদকে গ্রহণ করলেন। এভাবে দক্ষিণভারত প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীত ও ঠাটবাদী সঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে মেলবাদকে ধ্বংস করে পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর ৭২ ঠাটবাদ যা গণিতের ওপর ভিত্তি করে ও পারসিক শুদ্ধ ও কোমল স্বরকে সর্বতোভাবে স্বীকার করে সৃষ্টি। যাতে ঠাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও কোমল রূপের প্রয়োগকে মেনে নেওয়া হল। ফলে দক্ষিণী সঙ্গীত উত্তরী সঙ্গীত থেকে ভিন্নতর খাতে বইতে লাগল। চমক সৃষ্টি করার জন্য দ্বাদশ-স্বরের কিছু নাম পরিবর্তন করা হল, যেমন চতুঃশ্রুতিক ঋষভ, ষট্‌শ্রুতিক ঋষভ ইত্যাদি। কিন্তু তা পারসিক দ্বাদশ স্বরের নামভেদ ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই যাঁরা আজও দক্ষিণী বা কর্ণাটকী সঙ্গীতকে প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের শুদ্ধ রূপ বলে মনে করেন, তাঁরা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে।

যাইহোক পরিশেষে বলি, ভারতীয় সঙ্গীতে বহু বিবর্তন ঘটলেও প্রাচীন ধারাটি আজও অন্তঃসলিলার মত প্রবহমান যা কেবল সত্যদ্রষ্টা গুণী ও প্রাচীন মূর্ছনাবাদীদের দ্বারাই উপলব্ধ হতে পারে।

প্রদীপ কুমার ঘোষ

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. with the Reg. of Newspapers for India No. R. N. 8571/57